ভাগে ঋর্ক্ষাস্থির সহিত; নেত্রচ্ছদিফলকের বহিঃসীমায় সম্মুখার্দ্ধে গণ্ডাস্থির সহিত এবং পশ্চার্দ্ধে জতূকাস্থির সহিত; ললাটফলকের পশ্চিম ধারায় পার্শ্বকপালের সহিত। তন্মধ্যে জতূকাস্থি ও ঋর্ক্ষাস্থি এই দুইখানি একত্র অস্থি এবং নাসাস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি, শঙ্খাস্থি, ঊর্দ্ধ হনুস্থি ও পার্শ্বকপালাস্থি এইগুলি যুগ্ম অস্থি। সুতরাং এক এক দিকে সাতখানি অস্থির সহিত সন্ধি হইলেও উভয় দিকে মোটের উপর বারখানি অস্থির সহিত সন্ধি হয়।

পেশী— পুরঃকপালে তিন জোড়া পেশী সংলগ্ন থাকে। উভয় দিকের ভ্রূমধ্যে দুই জোড়া এবং শঙ্খতোরণিকায় এক জোড়া।

শঙ্খাস্থি—* পার্শ্বকপালদ্বয়ের নিম্নে দুই রগে দুইখানি শঙ্খাস্থি অবস্থিত। প্রত্যেক শঙ্খাস্থির তিনটী ভাগ যথা,—শঙ্খচক্র, কর্ণমূলপিণ্ড এবং অশ্মকূট।

(১) শঙ্খচক্র—ইহা শঙ্খদেশনির্ম্মাণকারক প্রায় চক্রাকার অস্থিফলক। ইহার বহিস্তল মসৃণ এবং ধমনী ধারণের চিহ্নে অঙ্কিত। শঙ্খচক্রের দীর্ঘ ও সম্মুখদিকে বর্দ্ধিত অংশ গণ্ডাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত বলিয়া 'গণ্ডপ্রবর্দ্ধনক' নামে খ্যাত। এই প্রবর্দ্ধনকের ঊর্দ্ধ ও অধোভেদে দুইটী ধারা। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ ধারায় 'শঙ্খাবরণী কলা' সংযুক্ত থাকে। অধোধারার নিম্নদিকে সম্মুখ ভাগে যে অর্ব্বুদ আছে, উহা 'সন্ধ্যর্ব্বুদ' নামে অভিহিত এবং

[২৬শ চিত্র—শঙ্খাস্থি (অন্তস্তল)]

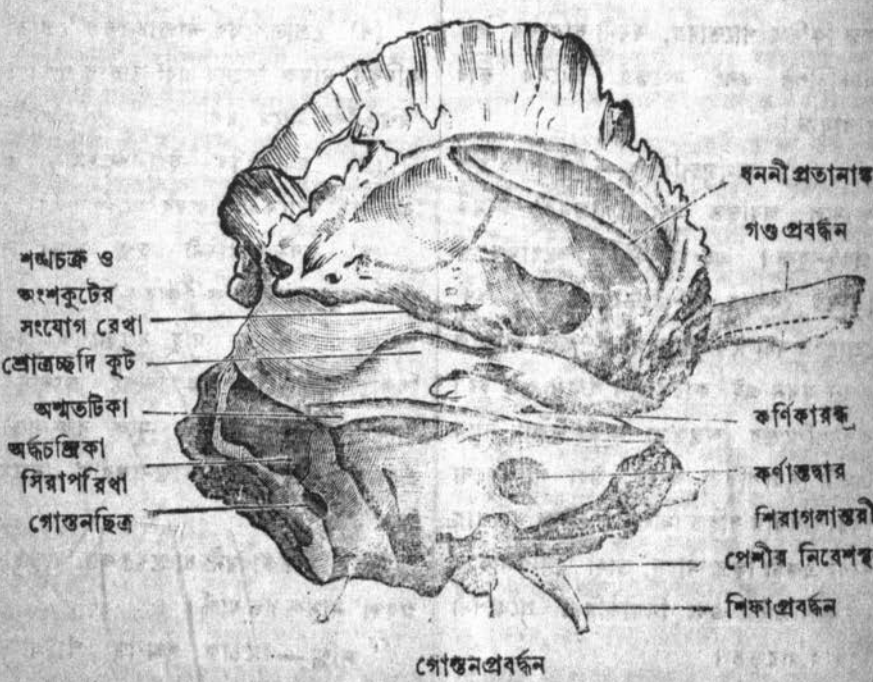

* ইং—Temporal Bones—টেম্পোরাল বোন্স্।

হনুসন্ধির সম্মুখভাগে অবস্থিত। সন্ধ্যর্ব্বুদের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত 'হনুসন্ধিস্থালক' নামক কোটর অধোহনুমুণ্ড ধারণ করিয়া থাকে। হনুসন্ধিস্থালকের পশ্চাতে 'কর্ণকুহর' অবস্থিত। কর্ণকুহরের পরিধিতে 'কর্ণশষ্কুলী' নির্ম্মাণকারক তরুণাস্থিগুলি সংযুক্ত থাকে। কর্ণকুহর ও হনুসন্ধিস্থালকের মধ্যবর্ত্তী অস্থিফলক 'কর্ণমূলফলক' নামে অভিহিত এবং উহা কর্ণমূলীয় লালাগ্রন্থির আশ্রয় স্থান। গণ্ডপ্রবর্দ্ধনের পশ্চাদ্‌ ভাগে 'শঙ্খতোরণিকা' একটী সমুন্নত রেখা আছে, উহা পূর্ব্বোক্ত শঙ্খতোরণিকা রেখার সহিত মিলিত। এই রেখার অধোভাগে আর একটী রেখা আছে, উহা শঙ্খ চক্রের সহিত কর্ণমূলপিণ্ডের সংযোগের চিহ্ন স্বরূপ।

শঙ্খচক্রের অন্তস্তল মস্তিষ্কপিণ্ড ধারণের জন্য কিঞ্চিৎ খাতোদর, ধমনী ধারণের জন্য খাঁজবিশিষ্ট এবং মৎস্যের আঁসের ন্যায় ধারাযুক্ত।

(২) কর্ণমূলপিণ্ড—এই অস্থিপিণ্ড কর্ণমূলে অবস্থিত এবং 'গোস্তনক' নামক প্রবর্দ্ধনযুক্ত। এই প্রবর্দ্ধনটী অধোমুখ ও ভিতরে কোটর বিশিষ্ট,—কোটরগুলি কর্ণস্রোতের মধ্যপথের অনুষঙ্গী। কাণ পাকিলে কখন কখন এই কোটরগুলি পর্য্যন্ত পূঁয হয়। কর্ণমূলপিণ্ডের অন্তস্তলে 'অর্দ্ধচন্দ্রিকা' নামে একটী সিরাপরিখা আছে, উহা পার্শ্বিকাখ্য সিরাপরিখার সহিত মিলিত। উক্ত পরিখার মধ্যে একটী ছিদ্র আছে, তাহা 'গোস্তনছিদ্র' নামে অভিহিত এবং সিরাপরিখা প্রবেশিনী সিরার দ্বারভূত।

(৩) অশ্মকূট—শঙ্খাস্থির এই অংশ প্রস্তরের ন্যায় ঘনসঙ্ঘাত, চারিটী ধারাযুক্ত এবং শিরঃসম্পুটভূমির মধ্যে তির্য্যক্‌ভাবে প্রবিষ্ট। ইহার ঊর্দ্ধদেশ শিরঃসম্পুট নির্ম্মাপক এবং মস্তিষ্কভূমির অংশভূত। উহার অধোদেশ কর্ণপীঠ নির্ম্মাপক এবং কণ্ঠকুহরের ছাদের অংশভূত। অশ্মকূটের অভ্যন্তরে তিনখানি সূক্ষ্ম কর্ণাস্থি এবং শ্রুতিযন্ত্র নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত। নিম্নে অশ্মকূটের বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়গুলি লিখিত হইতেছে :—

(ক) ঊর্দ্ধসীমায় শঙ্খচক্রের সহিত সংযোগাঙ্ক রেখা এবং ইহার উপকণ্ঠে কূটাগ্রভাগের নিকট দুইটী রন্ধ্রমার্গ আছে। ঊর্দ্ধদিকের রন্ধ্রমার্গ 'পটহোত্তংসিনী' পেশীর প্রবেশের দ্বার এবং অধোদিকের রন্ধ্রমার্গ কর্ণস্রোতের মধ্যপথের সহিত মিলিত ও 'পটহপূরিকা' নাম্নী ক্ষুদ্র নলিকার দ্বার স্বরূপ।

(খ) শ্রোত্রপথের আচ্ছাদনভূত 'শ্রোত্রচ্ছদিকূট' নামক উৎসেধ এবং তাহার পশ্চাতে 'অশ্মতটিকা' নামে রেখা।

(গ) 'কর্ণান্তর্দ্বার'—ইহা 'শ্রুতনাড়ী' ও 'বক্ত্রনাড়ী' নামে নাড়ীদ্বয়ের প্রবেশ পথ।

(ঘ) কর্ণভূমিগামিনী সূক্ষ্ম নাড়ী ও ধমনী প্রবেশের জন্য 'কর্ণিকারন্ধ্র'।

(ঙ) পেশী ও স্নায়ু সংযোগের জন্য শিকড়ের ন্যায় আকার বিশিষ্ট অধোমুখ 'শিফাপ্রবর্দ্ধনক'। ইহার মূলে বক্ত্রনাড়ী প্রবেশের জন্য 'শিফাগোস্তনান্তরীয়' নামে ছিদ্র আছে।

(চ) মাতৃকাধমনী ধারণের জন্য 'মাতৃকাসুরঙ্গা' নামক রন্ধ্রমার্গ।

সন্ধি—প্রত্যেক শঙ্খাস্থি পাঁচখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা, গণ্ডপ্রবর্দ্ধন দ্বারা গণ্ডাস্থির সহিত, শঙ্খচক্রধারার গণ্ডপ্রবর্দ্ধন

পর্য্যন্ত অংশে পার্শ্বকপালের সহিত, গণ্ড-প্রবর্দ্ধন হইতে অশ্মকূটাগ্র পর্য্যন্ত ধারায় পশ্চিম কপালের সহিত, অশ্মকূটের অগ্রভাগ হইতে গণ্ডপ্রবর্দ্ধনের উৎকণ্ঠ পর্য্যন্ত জতূকাস্থির সহিত এবং হনুসন্ধিস্থানকে অধোহনুস্থির মুণ্ডের সহিত।

পেশী—প্রত্যেক শঙ্খাস্থিতে পনেরটী করিয়া পেশী সংযুক্ত থাকে। বিবরণ যথা স্থানে বর্ণনীয়।　　(ক্রমশঃ)

কচু।

[অধ্যাপক—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ]

১১৭৬ সনে যে দৈব দুর্ব্বিপাক 'দুর্ভিক্ষ' রূপে এদেশে দেখা দিয়াছিল—তাহার নাম "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর"। এই সময় অনেককে "দগ্ধকচু" খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় সেই সময় হইতেই "কচু পোড়া খাও"—বাঙ্গালীর বড় গালাগালি। যেখানে অকৃতকার্য্যতা, সেইখানেই বিজ্ঞজনের মুখে বিদ্রূপ বা উপহাস—এই অকিঞ্চিৎকর "কচুপোড়ার" স্মৃতি! কচু এতই অবহেলার সামগ্রী!

এ হেন কচুর মান রাখিয়াছিলেন কেবল বৈদ্য-কবি দেবেন্দ্রনাথ। তিনি "রাঙাদিদির মধ্যস্থতায়, "ভারতীর" পদ্মপত্রে "দগ্ধকচু" পরিবেশন করিয়াছিলেন। তাহা নাকি অনেকেরই ভাল লাগিয়াছিল। ভরসা পাইয়া বন্ধু আমার সেই কচু আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের পবিত্র নামে নিবেদন করিয়াছিলেন। সাহিত্য গুরুর যোগ্য অর্চ্চনা বটে!

আজ আমিও তুচ্ছ 'কচুর' পসরা মাথায় লইয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমার ত 'রাঙাদিদি' সহায় নাই—তাই ভয় হইতেছে—পাছে ইহা পাঠক মহাশয়দের ভাল না লাগে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কচুকে লোকে যত অবজ্ঞা করে, কচু কি তত তাচ্ছিল্যের জিনিষ? কচু দরিদ্রের সম্বল। এখনও অনেক স্থলে দেখিয়াছি কচুর সাহায্যে বহু ব্রাহ্মণের দিন গুজরাণ হইয়া থাকে। হিন্দুর জীবন্ত বিজ্ঞান "আয়ুর্ব্বেদ" কচুকে কখনও উপেক্ষা করেন নাই। কচুর ভেষজগুণ আছে, কচু বড় পুষ্টিকর খাদ্য। সাধারণে ইহা জানেনা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেই কথারই আলোচনা করিব। আমি স্বয়ং ২৮ রকম কচুর গুণ পরীক্ষা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিব।

কচুর সংস্কৃত নাম "কচ্চি," হিন্দী নাম "কচ্চ"। য়ুরোপদত্ত বৈজ্ঞানিক নাম Arum. দেশ ভেদে কচুর আরও অনেক নাম আছে—যথা ট্যারো অড্ডা, টেনিয়া, অর্ভি, এডইক্, কিয়ম্, কচ আলু, টেরাস সালুপ্পা, টেলো, টেগ্রাস্, এবং Scratch co co ইত্যাদি। সংস্কৃতভাষায় কচুর পাতাকে "পেচুকা" এবং

ডাঁটাকে "কৈচুকা" বলে। কচুর মুখীর নাম —"বিতণ্ডা"।

কচুর গুণ।

পিচ্ছিল, গুরুপাক, তীব্র (Slringent) ভেদক, কফ, পিত্ত, আম ও বলবর্দ্ধক, কণ্ডু জনক এবং শুক্রকর।

নানা জাতীয় কচু।

(ক) বন্য কচু।

(Arnom Colocasia)

এই কচু বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জন্মে। পথের ধারে, পয়ঃপ্রণালীর পার্শ্বে, সিক্তভূমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কেহই ইহার চাষ করে না। এই কচুর পাতা হৃদ্-পিণ্ডাকার (Hert shuped)। পাতার উপরিভাগ সবুজবর্ণ, নিম্নদেশ ফিকে সবুজবর্ণ; কাণ্ড ক্ষুদ্র ও অন্তর্ভৌম। পত্রবৃন্ত মলিন সবুজ-বর্ণ, পুষ্প পীতবর্ণ। বৃন্তের নিম্নভাগ দ্বিখণ্ডিত। ইহার মূল অতিশয় তীব্র, খাইলে গলা ধরে। ইহার কচিপাতা খাওয়া যায়। কচিপাতা সংগ্রহ করিয়া কলার পাতার উপর স্তরে স্তরে সাজাইয়া, বেশ করিয়া জড়াইয়া—অগ্নিদগ্ধ করিতে হয়। পরে তাহাতে সর্ষপ তৈল, লবণ ও লঙ্কা মাখিয়া—শাকের মত খাইতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের গৃহস্থগণ ইহা ব্যবহার করেন। দরিদ্র কৃষকগণ—ইহার পাতার অম্বল রাঁধিয়া খায়। অম্বল রাঁধিতে হইলে পাতাকে কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, পরে পাকা তেঁতুল ও লবণ সংযোগে উহা রাঁধিতে হয়। খাইতে অনেকটা চুকা পালমের অম্বলেরই মত।

(খ) গুঁড়িকচু।

ভারতের সর্ব্বত্র ইহা জন্মিয়া থাকে। কি শুষ্ক কি সিক্ত উভয়বিধ মৃত্তিকাতেই—গুঁড়ি কচু উৎপন্ন হইতে পারে। এমন কি পাশ্চাত্য প্রদেশে ৮০০০ ফিট উচ্চ স্থানেও—এই কচুর চাষ হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্ বেত্তা রক্সবর্গ করেষ্টার, প্রেইন প্রভৃতি মনীষীগণ এই কচু সম্বন্ধে তাঁহাদের গ্রন্থে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। গুঁড়ি কচুর মধ্যে কতকগুলি শ্বেত এবং কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ডাক্তার নিকোল্স্—সবুজ ও বেগুণে বর্ণের কচুরও উল্লেখ করিয়াছেন। এই কচু অত্যন্ত মুখ প্রিয় সুখাদ্য।

(গ) ম্যানাকচু।

ইহার মূলে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার পাওয়া যায়। ইহার আদর নানাবিধ। এই কচু অত্যন্ত পুষ্টিকর। বেশ করিয়া ছাড়াইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া, ঘৃতে বা তৈলে ভাজিয়া খাইলে—বেশ লাগে। নিউগিনির লোকেরা এই কচু হইতে এক রকম ময়দা প্রস্তুত করে। সেই ময়দায় রুটী ও বিস্কুট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার কাণ্ডকে সিদ্ধ করিয়া হরিদ্রা ও সর্ষপ চূর্ণ, লঙ্কা, লবণ এবং তৈল মাখিলে একটী সুস্বাদু ব্যঞ্জন হইয়া থাকে।

(ঘ) এরকাকচু।

ইহার পাতা, ডাঁটা, মূল—সমস্ত অংশই তীব্র রস যুক্ত—খাইলে গলা ধরিয়া যায়। চূণের জলে কিম্বা অম্লদ্রব্যে ইহাকে অন্ততঃ ১ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে রন্ধন করিতে হয়।

(ঙ) ওয়ামকচু।

ইহাকেও অম্ল দ্রব্যে ভিজাইয়া পরে রন্ধন করিতে হয়। Hydrochloric,

Nitric. ও Acetic অ্যাসিড দ্বারা—ইহার কণ্ডু বা বিষদোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

(চ) শোলাকচু।

এই কচু কেবল পূর্ব্ববঙ্গেই জন্মিয়া থাকে, অন্যত্র বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার রীতিমত চাষও হইয়া থাকে। চাষও বেশ লাভজনক। ইহার তিনটী জাতি। ১। শ্বেত শোলাকচু। ২। কৃষ্ণ শোলা কচু। ৩। নারিকেলী কচু।

১। শ্বেত শোলাকচুর পত্র গাঢ় সবুজ-বর্ণ, শিরা পীতাভ, ডাঁটা ফিকে সবুজ এবং গোলাকার। নিম্নদেশ দ্বিখণ্ডিত, এই খণ্ডিত অংশে বেগুণে বর্ণের ডোরা কাটা। মূল ধূসর বর্ণ—গোলাকার এবং দীর্ঘ। নদীর চরে ইহার ফলন খুব ভাল হয়। গোবরের সার গোড়ায় দিলে—এ কচুর আস্বাদ বেশ মিষ্ট হয়। ঝোল, চড়চড়ি, ছেঁচ্‌কী প্রভৃতি সকল তরকারীতেই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকে ডালের সহিতও ইহা সিদ্ধ করিয়া খান।

২। কৃষ্ণ শোলা কচু। ইহা শ্বেত শোলা কচুরই মত। কেবল পত্র ও বৃন্ত কৃষ্ণবর্ণ। মূলের ত্বকও কৃষ্ণাভ। গাছ গুলি দেখিতে বড় সুন্দর।

৩। নারিকেলী কচু। পত্র পীতাভ সবুজ, হৃৎপিণ্ডাকার, অত্যন্ত দীর্ঘ। বৃন্ত স্থূল। নিম্নভাগ দ্বিখণ্ডিত, মূল প্রায় ২ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার ডাঁটা, পাতা, মূল, সমস্তই খাওয়া যায়। মূল সিদ্ধ করিলে খুব গলিয়া যায় না--কচ্‌কচ্‌ করে, কিন্তু গলা ধরে না, খাইতেও খুব সুস্বাদু। নারিকেলের শাঁসের মত চিবাইয়া খাওয়া চলে বলিয়াই ইহার নাম নারিকেলী কচু।

(ছ) ব্যাঙাকচু।

ইহা অনেকটা নারিকেলী কচুরই ন্যায়। নোয়াখালি, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, ময়মন সিং ও ঢাকা জেলায়—এই কচুর চাষ হইয়া থাকে।

(জ) জলকচু।

ইহাও ঠিক পূর্ব্বোক্ত কচুর মত। জলের সময় অর্থাৎ বর্ষা কালে—এই কচুর সাহায্যে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিগণের তরকারীর আয়োজন হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানেও এই কচু জন্মিয়া থাকে।

(ঝ) শুঁয়া কচু।

অত্যন্ত পুষ্টিকর—সুখাদ্য। ইহার পত্র-বৃন্তে—আলকুশীর মত শুঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হাতে লাগিলে হাত কুট কুট করে। এই কচু গভীর জঙ্গলে আপনা হইতে জন্মে। ইহা অম্লের সহিত সিদ্ধ করিয়া, তৈল ও লবণ সংযোগে ভক্ষণ করিতে হয়।

(ঞ) ঢোলাকচু।

ইহা পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। ইহার পাতা অতি ক্ষুদ্র, পাতার শিরায় এক রকম শুভ্র পদার্থ লাগিয়া থাকে। গাছ গুলি মৃত্তিকা হইতে ৪ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হয় না। মূল গোলাকার, অত্যন্ত ভারি। এই কচু খাইতে বড়ই সুমিষ্ট। পাহাড়ী জাতিরা বলে—এই কচু সিদ্ধ করিয়া খাইলে জোলাপের কার্য্য করে।

(ট) বিন্নীকচু।

(Arum kheshianum var.)

ইহা এক প্রকার পাহাড়িয়া কচু; ইহার কন্দ দীর্ঘকার—এক একটী কন্দ দৈর্ঘে ১ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কন্দের স্থূলতা প্রায় ৪ ইঞ্চি। কন্দ ধূসরবর্ণের আঁইসে আবৃত

থাকে। ইহা অতি উপাদেয়, পাহাড়িয়াগণ আহ্লাদের সহিত ইহার চাষ করিয়া থাকে।

(ঠ) বোয়া কচু।

ইহার পত্র সমূহ গোলাকার—ঠিক পদ্ম পাতার মত। জলের ধারে জন্মে। এই কচুর কন্দ চূর্ণ করিয়া শর্করা সহ সেবন করিলে, উদারাময়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

(ড) আঁকুড়ীকচু।

ইহার জন্মস্থান—সাঁওতালের দেশ। গাছ ছোট, কিন্তু কন্দ খুব বড় এবং অঋজু ও দীর্ঘাকার। সাঁওতালগণ ইহা সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। এই কচু অত্যন্ত পুষ্টিকর।

(ঢ) মুখীকচু।

(Arum Ægypticum of Dr. Roxburgh.)

গাছ সাধারণ কচু গাছের মত। অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি, পত্র ক্ষুদ্র, পত্রবৃন্ত হ্রস্ব। ইহার কন্দ, পত্র ও বৃন্ত অখাদ্য। কন্দ হইতে এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতান বাহির হইয়া থাকে—উহা ঠিক শকরকন্দ আলুর মত। এই গুলিই খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। এই মুখী গুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়। অল্প উত্তাপেই এই মুখী গুলি গলিয়া যায়, তা'র পর লঙ্কা, তৈল ও লবণ সংযোগে—ইহা গলাধঃকরণ করিতে হয়। এই কচুর রসে—অতি দূষিত ক্ষতও শুষ্ক হইয়া থাকে।

ডাক্তার রক্সবর্গ বলেন—এই কচুর জন্ম স্থান ইজিপ্ট দেশ। আমি কিন্তু একথা বিশ্বাস করিনা। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে মুখী কচু প্রচলিত। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার চাষও হইয়া থাকে।

(ণ) আলুকচু।

ইহা প্রায় মুখী কচুরই মত। ইহারও বৃহৎ মূল অখাদ্য। মূল হইতে বহির্গত মুখী গুলিই ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পার্থক্যের মধ্যে—ইহার মুখীগুলি গোল-আলুর মত পিণ্ডাকার। পশ্চিম বঙ্গে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

(ত) পঞ্চমুখীকচু।

এই কচুর জন্মস্থান নাগা ও গারো পাহাড়। ইহার আসল কন্দ হইতে চঞ্চুবৎ পাঁচটী উপকন্দ বাহির হইয়া থাকে। আবার কোন কোন কন্দ হইতে ৩টী, ৪টী, এমন কি সাতটী পর্য্যন্ত উপকন্দ বাহির হইয়া থাকে। ইহার কন্দ অতি বৃহৎ—এক একটীর ওজন ৬।৭ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহা উচ্চ শুষ্ক ভূমিতে জন্মে। জলা জমীতে কন্দ পচিয়া যায়। এই কচু—কচুর রাজা। খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু, ইহাতে গলা ধরিবার আদৌ আশঙ্কা নাই। কন্দে প্রচুর পরিমাণে শ্বেত সার আছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর। ইহা হইতে একপ্রকার ময়দা প্রস্তুত হয়, সেই ময়দার চাপাটী—অতি সুখাদ্য।

(থ) পেচা কচু।

জন্মস্থান খাসিয়া পর্ব্বত। মূল অত্যন্ত বৃহৎ—চুপড়ী আলুর মত। খাইতে সুস্বাদু। এই কন্দ চূর্ণ করিয়া, ঘৃত ও চিনী সহযোগে হালুয়ার মত পাক করিয়া খাইলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(দ) জারা কচু।

জন্মস্থান জান্তিয়া পাহাড়। কন্দ বৃহৎ। উপরের ত্বক নিষ্কাসিত করিলে, আলতার মত রক্তবর্ণ বাহির হইয়া থাকে। ইহাও অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধিকারক।

(ধ) শর কচু বা সাপলা কচু।
(Arum Nymrafolium of
Dr. Rosburgh.)

এই কচুর পাতা ঠিক কুমুদ (হেলা, শালুক) পত্র সদৃশ। ইহা জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই জন্মে। জলে গাছগুলি খুব বাড়ে। ইহার পত্র ও বৃন্ত—অরুণাভ। এই কচুর সকল অংশই খাওয়া যায়, তবে গলা ধরা দোষ বিলক্ষণই আছে। এই কচু, কচু জাতির মধ্যে বৃহত্তর। ইহা রক্তবর্দ্ধক, বলকারক—প্লীহা, যকৃৎ ও শোথনাশক, মূত্রকারক ও ভেদক।

(ন) চিঙ্গাড় কচু।

ইহার কন্দ ঠিক আতা ফলের মত গণ্ড গাত্র এবং পিণ্ডাকার। হিমালয়ের স্থানে স্থানে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সামান্য অগ্নিতাপে দগ্ধ করিয়া খাইতে হয়। দগ্ধ করিলে—ঠিক ডেলা ক্ষীরের মত সুগন্ধি ও সুস্বাদু হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত রসকারক।

এই কচু খাইলে, দুএকদিন উপবাসে শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে না। দুঃখের বিষয় ইহা বড়ই দুর্লভ, অনেক অনুসন্ধানে দুই চারিটী পাওয়া যায়।

(প) গোঁদো কচু।
(Arum. fragrantossimum.)

ঘনিয়া, নাগা ও গারো পাহাড়ে—এই কচু জন্মিয়া থাকে। ইহার কন্দে এক রকম সুগন্ধ পাওয়া যায়। কাণ্ড ধূসরবর্ণ—দৈর্ঘ্যে ৩।৪ ফুট, স্থূলতা ২।৩ ইঞ্চি। ইহার পত্র—হৃদ্ পিণ্ডাকার, পত্রের বর্ণ শ্বেতাভ সবুজ—দেখিলে মনে হয় যেন রৌপ্যের মত ঝক্‌মক্ করিতেছে। পত্রের বৃন্ত শীর্ণ—এবং ঘাপ্ কাটা। কন্দ ছাড়াইলে রক্তাভ, শ্বেতবর্ণের শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এই কন্দই খাইতে হয়। ইহা এতদূর সুগন্ধী যে—এই কচুর দ্বারা যে ব্যঞ্জন পাক করা যায়, তাহাও সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

এই কচু ভক্ষণ করিলে—অসম্ভবরূপে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, ইহা পাচক, সারক, শোণিতবর্দ্ধক এবং অত্যন্ত পুষ্টিকর। উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিশারদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ—এই কচুর চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। গারোপাহাড় হইতে চারা আনাইয়া আমার পাঠক মহাশয় ও ইহার চাষ করিতে পারেন। ঈশ্বর বাবুর দেখা দেখি, আমিও ইহার চাষে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলাফল—পরীক্ষাধীন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

(রায় শ্রীচুণীলাল বসু আই এস্ ও এম্ বি, এফ্ সি এস্ বাহাদুর।)

সংক্রামক রোগ নিবারণ।

কি উপায় অবলম্বন করিলে কতিপয় সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং উহার বিস্তৃতি নিবারণ করা যাইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলেরা বা ওলাউঠা।

১। একপ্রকার বীজাণু, খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই ভীষণ রোগ উৎপন্ন হয়। এই বীজাণু অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং কলেরার সময়ে কোন খাদ্যদ্রব্য কাঁচা বা শীতল অবস্থায় ভক্ষণ করা উচিত নহে। সকল দ্রব্যই রন্ধন করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে খাইবে।

২। পানীয় জল ও দুগ্ধ উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইবে।

৩। খাদ্য দ্রব্যের উপর যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

৪। কলেরা রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি নদী বা কোন পুষ্করিণীতে কিম্বা কোন কূপের নিকট কাচিবে না। বস্ত্রাদি ফেনাইলে (Phenyle) ভিজাইয়া, জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে সংক্রামক দোষ নষ্ট হইয়া যায়। এক ভাগ ফেনাইল্—বিশ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে।

৫। কলেরা রোগীর বিছানা এবং মল ও বমনাদি খড়ের উপর ঢালিয়া কেরোসিন সাহায্যে পুড়াইয়া দেওয়া উচিত, তাহা না হইলে বাটী হইতে দূরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুতিয়া ফেলিবে।

৬। যাঁহারা রোগীর পরিচর্য্যা করিবেন, তাঁহারা ফেনাইলের উপরোক্ত দ্রাবণ এবং সাবান ও জল দিয়া হাত উত্তমরূপে না ধুইয়া কোনরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য বা পানীয় স্পর্শ করিবেন না।

৭। কলেরার সময়ে কেহ খালি পেটে থাকিবে না এবং অধিক রাত্রি জাগিবে না।

৮। বাসগৃহ ও তাহার চতুঃপার্শ্ব পরিষ্কার রাখিবে, তাহা না হইলে মাছির উপদ্রব হইয়া বাটীতে এবং গ্রামের মধ্যে কলেরা ছড়াইয়া পড়িবে।

রক্তামাশয়।

এই রোগের বীজ অনেক স্থলে দূষিত পানীয় জলের সহিত শরীরে প্রবেশ করে। বালক বালিকাদের রক্তামাশয় রোগ হইলে উহাদিগের মল যথাতথা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; ইহার ফলে মাছি দ্বারা বা অন্য উপায়ে খাদ্য

দ্রব্য ও পানীয় জল ঐ রোগের বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হয় এবং এইরূপে সুস্থ লোকের শরীরে ঐ রোগ প্রবেশ লাভ করে। সুতরাং রোগীর মল সম্বন্ধে সাবধান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। রোগীর মল ও মলদুষ্ট বস্ত্রাদি পুড়াইয়া ফেলিবে অথবা দূরে মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবে। জল ফুটাইয়া পান করিলে এ রোগের হাত হইতে অনেকাংশে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

যক্ষ্মারোগ।

১। পরিবারস্থ কাহারও এই রোগ হইলে দেহ গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রোগীকে সর্ব্বদা খোলাস্থানে রাখিবে। দালান, বারাণ্ডা, দাওয়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মুক্তস্থানে রোগীর শয়নের ব্যবস্থা করিবে।

২। যক্ষ্মার বীজ রোগীর কফের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। রোগী যথাতথা কফ ফেলিলে উহা শুকাইয়া তন্মধ্যস্থিত বীজাণুগুলি ধূলির সহিত মিশ্রিত হয় এবং বায়ুর সাহায্যে নিঃশ্বাসের সহিত সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ লাভ করে এবং তদ্দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয়। সেইজন্য একটি ফেনাইল্ মিশ্রিত জলপূর্ণ নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রোগীর কফ পরিত্যাগ করা উচিত। পরে উহা পুড়াইয়া ফেলিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

৩। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তি কখনও এক পাত্রে পান ভোজন করিবে না, এক গামছা, তোয়ালে বা বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে না এবং এক বিছানায় শুইবে না।

৪। কখনও কখনও গরুর যক্ষ্মা হইতে মানুষের যক্ষ্মা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। দুধের সহিত গরুর যক্ষ্মার বীজ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। দুধ উত্তমরূপে ফুটাইয়া খাইলে এই রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৫। যক্ষ্মা-পীড়িত মাতা সন্তানকে স্তন্য-পান করাইবেন না।

৬। পুরুষ বা স্ত্রীলোকের যক্ষ্মার সূত্র-পাত হইলে তাহার কোন মতেই বিবাহ করা উচিত নহে।

বসন্ত।

১। বাটীতে বা গ্রামে এই রোগ দেখা দিলে প্রত্যেক পরিবারের ছোট বড় সকলেরই ইংরেজী "টীকা" লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা "টীকা" থাকিলেও মহামারীর সময়ে ইংরেজী "টীকা" লইতে দেরী করিবে না। "টীকা" না লইয়া যেন কোন ব্যক্তি রোগীর পরিচর্য্যা না করেন এবং তিনি যথাসম্ভব অন্য লোকের সহিত কম মেলা মেশা করিবেন।

২। রোগীর বস্ত্রাদি জলে উত্তমরূপে না ফুটাইয়া ধোবাবাড়ী কখনই পাঠাইবে না।

৩। বসন্ত রোগীর গায়ে কখনও মাছি বসিতে দিবে না; তাহাকে সর্ব্বদা মশারির ভিতরে রাখিবে।

৪। বাড়ীতে বসন্ত বা যে কোনরূপ সংক্রামক রোগ হইলে বালক বালিকাদিগকে কিছুদিনের জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা বন্ধ রাখিবে।

৫। বসন্তের "ছাল" যতদিন না সম্পূর্ণ-ভাবে উঠিয়া যায়, ততদিন রোগী সুস্থ ব্যক্তির সহিত কিছুতেই মিশিবেন না। এই ছালে বসন্তের বীজাণু থাকে। ইহা যথাতথা ফেলিবে

না, ফেনাইল পূর্ণ পাত্রে সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

ম্যালেরিয়া।

১। আজকাল নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, একজাতীয় মশকের দংশনের দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজ বাস করে। মশক ঐ রোগীকে দংশন করিয়া উহার রক্তশোষণকালে রোগের বীজ গ্রহণ করে এবং পরে সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিয়া তাহার শরীর মধ্যে ঐ বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে ঐ ব্যক্তি ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। সুতরাং মশার উপদ্রব নিবারিত হইলে ম্যালেরিয়া রোগ কমিয়া যায়।

২। নালা ডোবা ইত্যাদিতে জল জমিলে তথায় মশা ডিম পাড়ে এবং অসংখ্য মশক উৎপন্ন হইয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া রোগ বিস্তার করে। এইজন্য বাড়ীর নিকটস্থ খানা ডোবাগুলি ভরাট করিলে মশার উপদ্রব কম হয়। ভরাট করা সম্ভব না হইলে কিছু পরিমাণ জালানি কেরোসিন তেল তন্মধ্যে ঢালিয়া দিলে মশকশাবকগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। গ্রামের বড় পুষ্করিণীর মধ্যে কই, খলিশা, তেচোকো, পাঁচচোকো, পুঁটি প্রভৃতি মাছ জন্মাইলে তাহারা অতি শীঘ্র মশকশাবকদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। মশকের ডিম ও শাবক ইহাদিগের প্রধান আহার।

৩। বাড়ীর মধ্যে বা চতুঃপার্শ্বে ঝোপ বা জঙ্গল থাকিতে দিবে না। দিবাভাগে ম্যালেরিয়াবাহী মশকের উপদ্রব থাকে না, তখন তাহারা এই সকল ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় হইতেই তাহারা দেখা দেয় এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি লোককে দংশন করে।

৪। যে চারি মাস ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব থাকে, সেই সময়ে ঘরজোড়া মশারি প্রস্তুত করিয়া পরিবারস্থ সকলেরই সন্ধ্যার সময় হইতে সমস্ত রাত্রি তন্মধ্যে বাস করা উচিত। ঘরজোড়া মশারি হইলে তন্মধ্যে রন্ধন ব্যতীত অন্যান্য সাংসারিক কার্যকর্ম্ম করিবার বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না, অথচ মশার আক্রমণ হইতে একেবারে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পাওয়া যাইবে। পল্লীগ্রামে মশারি না খাটাইয়া কেহ কখনও নিদ্রা যাইবে না। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে প্রতিগৃহে ধূপধুনা দেওয়া উচিত।

৫। হাতে পায়ে খাঁটি সরিষার তেল মাখাইয়া রাখিলে মশার আক্রমণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

৬। কুইনাইন্ ম্যালেরিয়া রোগের একমাত্র মহৌষধ। কুইনাইন্ ব্যবহার করিলে রক্তস্থিত ঐ রোগের বীজ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। কুইনাইনে ম্যালেরিয়া রোগ যেমন আরোগ্য হয়, তেমনি ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে সুস্থ ব্যক্তি যদি সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিন পাঁচ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন্ সেবন করেন, তাহা হইলেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন—ইহা বহু পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ম্যালেরিয়ার চারি মাস গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেরই অল্প পরিমাণে

যথারীতি কুইনাইন সেবন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্লেগ্।

প্লেগ্‌রোগ ভারতবর্ষের অনেক স্থানে মহামারীরূপে আবির্ভূত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নাশ করিতেছে। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাংলা দেশে ইহার অত্যাচার কম, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাংলার অনেক প্রদেশে এই রোগ এখন পর্য্যন্তও দেখা দেয় নাই। বেহার অঞ্চলে এই রোগের খুব প্রাদুর্ভাব। এই রোগ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের জানিয়া রাখা উচিত।

১। এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকার দংশন দ্বারা প্লেগ্ রোগ উৎপন্ন হয়।

২। মানুষের প্লেগ্ হইবার পূর্ব্বে ইঁদুরের প্লেগ্ হইতে দেখা যায়। প্লেগ্‌গ্রস্ত ইঁদুরের গায়ে প্লেগের পোকা থাকে। ইঁদুর মরিলে ঐ পোকা তাহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া মাটীতে আশ্রয় লয় এবং তথা হইতে সুস্থ ব্যক্তির গায়ে উঠিয়া দংশন করিয়া প্লেগ্ রোগের বীজ তাহার শরীরে সংক্রামিত করিয়া দেয়। বাড়ীতে যাহাতে ইঁদুরের উপদ্রব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

৩। যখন দেখিবে অকারণে বাটীতে অনেক ইঁদুর মরিতেছে, তখনই জানিবে যে তাহারা প্লেগ্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ দেখিলে বাড়ী ছাড়িয়া ফাঁকা জায়গায় ঘর বাঁধিয়া কয়েকদিন বাস করিবে এবং বাটী, ঘর, দুয়ার, ফেনাইল্ বা অন্য কোনরূপ বিশোধক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া দিবারাত্রি খুলিয়া রাখিয়া দিবে।

৪। মৃত ইঁদুর কখনই হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না। চিম্‌টার দ্বারা উহাকে উঠাইয়া ফাঁকা জায়গায় খড়ের উপর কেরোসিন তেল ঢালিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে।

৫। বাটীর সমুদয় স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যাহাতে যথেষ্ট রৌদ্র ও বায়ু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। যে বাটীতে বেশী রৌদ্র ও বায়ু যায়, তথায় প্লেগরোগ প্রায় হয় না। প্লেগ্‌রোগের বীজ রৌদ্র সংস্পর্শে শীঘ্র মরিয়া যায়।

৬। প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ করিলে বা উহার সেবা শুশ্রূষা করিলে উক্ত রোগ হয় না। তবে শরীরের মধ্যে ঘা থাকিলে প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ করা উচিত নহে। প্লেগ্ রোগীর থুথু বা কফ যাহাতে সুস্থ ব্যক্তির চোখে মুখে না লাগে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

৭। প্লেগ্ রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি পুড়াইয়া ফেলা উচিত। নতুবা বস্ত্রাদি বিশোধক ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া, জলে ফুটাইয়া, প্রখর রৌদ্রে রাখিয়া দিলে উহার পুনর্ব্যবহারে কোন ভয় থাকে না।

৮। প্লেগের প্রাদুর্ভাব সময়ে খালি পায়ে থাকা উচিত নহে। যাঁহাদের ক্ষমতায় কুলাইবে, তাঁহারা এই সময়ে মোজা জুতা সর্ব্বদা পরিয়া থাকিবেন। গরীব লোকে পুরাণ কাপড়ের পটী দ্বারা পদদ্বয় হাঁটু পর্য্যন্ত জড়াইয়া রাখিলে প্লেগের পোকার দংশন হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাইতে পারিবে।

৯। প্লেগের "টীকা" লইলে কিছুদিনের জন্য ঐ রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

নব-বর্ষ।

(সন ১৩২৭ সাল)

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

(১)

পরিধানে চম্পকের চারু পীতাম্বর,
শিরে শোভে অশোকের কিরীট সুন্দর,
বকুলের বীরবৌলি শ্রবণ যুগলে,
নব মল্লিকার হার দুলিতেছে গলে,
ভালে বালার্কের ফোঁটা—ভাস্বর উজ্জ্বল—
ফুল্ল কোকনদ জিনি রাঙ্গা পদতল ;
ওষ্ঠাধরে কি নির্ম্মল হাসির লহর,
তরুণ যুবক ! তুমি কেগো যাদুকর ?

(২)

এক হস্তে "নীলাপদ্ম" গঠনে নিরত,
অন্য করে—সংহারের উপাদান কত !
কিবা দিব্য সৌম মূর্ত্তি—উদার গম্ভীর—
নিরখি' সম্ভ্রমে সবে নত করে শির,
সৃজনের বীজ মন্ত্র উচ্চারণ করি',
কেগো তুমি দেখা দিলে রাজবেশ ধরি ?
এক চ'ক্ষে অশ্রুজল, অন্য নেত্রে প্রীতি,
তুমিই কি "নব-বর্ষ, নবীন অতিথি ?

(৩)

তোমার আসার আগে, এসেছিল যা'রা,
বিশ্বাসঘাতক, শঠ প্রবঞ্চক, তা'রা।
পূজা খেয়ে— ক'রে গেছে বক্ষে পদাঘাত,
দেখে গেছে নয়নের নিত্য অশ্রুপাত ;
শ্মশানের চিতা মধ্যে ব'সে আছি মোরা,
"নূতনে"ডাকিতে,তবে কে বাজাবে হোরা ?
উদ্যম উৎসাহ —নাই কারো প্রাণে আর—
বর্ষরাজ ! অভ্যর্থনা হ'বে না তোমার।

(৪)

"হর প্রতি প্রিয় ভাষে সুধান্ পার্ব্বতী
বৎসরের ফলাফল—কহ পশুপতি।"
যুগযুগ ধরি'—ইহা লেখে পঞ্জিকাতে,
এবার সে ভার মোরা লব নিজ হাতে।
জিজ্ঞাসি তোমায়, রাজা ! বল দেখি তুমি—
সুখে কি অসুখে রবে এই বঙ্গভূমি ?
বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ আলো কি আঁধার !
ভাগ্যের "বজেট" খোল দেখি একবার !

(৫)

সেই নিশি, সেই দিবা, সেই ফুল ফল,
সেই শশী, সেই রবি, বায়ু, বহ্নি, জল,
সেই পাখী, সেই শাখী, সেই কান্না হাসি,
সেই জন্ম, সেই মৃত্যু—আছে পাশাপাশি,
সেই সৃষ্টি, সেই লয়, সবই পুরাতন,
তোমার শাসনে –রাজা ! কি হ'ল নূতন ?
কোন্ গুণে "নববর্ষ" নাম তবে পেলে ?
কি পরিবর্ত্তন তরে, বল তুমি এলে ?

(৬)

কাহার 'দায়াদ সূত্রে' নিলে রাজ্য-ভার ?
কোন্ ষড়যন্ত্রী —মন্ত্রী হইল তোমার ?
শুষ্ককণ্ঠ পল্লীবাসী,—পিপাসায় মরে—
জল মাপিবার ভার দিলে কার করে ?
"মেঘ ফল" রৌদ্র ফল প্রকাশিয়া কহ'—
বায়ুর অধিপ হ'ল কোন্ দুষ্ট গ্রহ ?
কার প্রতি কোন কর্ম্ম, ক'রে দিলে ভাগ ?
বুঝাবে কি সে' রহস্য, ওহে মহাভাগ !

(৭)

শস্যাধিপ হ'ল বুঝি "দুর্ভিক্ষ আপনি ?
সন্তানে চিবায়ে খাবে ক্ষুধার্ত্ত জননী ?
গৃহে গৃহে "ম্যালেরিয়া" ধ্বংস হ'ল দেশ,
যমরাজ নিজে বৈদ্য—"বৈদ্যফল" বেশ !!
ক্ষুদ্রতার মহাদম্ভ, পাপের প্রসার,
তুমি কি করিবে রাজা ! এর প্রতিকার ?
ভূলোকে পুলকে আনি' দ্যুলোক বিজ্ঞান
পারিবে কি করিতে এ জাতির কল্যাণ ?

(৮)

কুমারীর আত্মহত্যা, ঘৃণ্য বর পণ,
চৌর্য্য, দ্বেষ, ব্যভিচার, অকাল-মরণ,
বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, মহামারী ভয়,
দেব ভোগ —ভেজালে হ'তেছে বিষময়,
স্বাস্থ্যহীন, ক্ষয়ক্ষীণ, দীন নারী নর,
গেছে ভুলে—"আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্রের আদর,
পার যদি—ঘুচাইতে এসব প্রমাদ —
বিদায়ের কালে দিব শত ধন্যবাদ।

শিশু পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ, সরস্বতী]

—:০:—

শিশুর দেহ উপযুক্তরূপে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইলেই তাহার মস্তিষ্কও পুষ্ট হইয়া উঠিবে। শিশুর প্রথম বৎসরে তাহার মস্তিষ্ক পুষ্ট ও গঠিত করিবার জন্য বাহির হইতে কোন আয়োজনের প্রয়োজন নাই। প্রথম বৎসরটি শিশুর দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই মস্তিষ্কের গঠন হইবে। প্রত্যেক মাতাই এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখিবেন। আমরা অনেক নবীনা মাতাকে শিশুর চক্ষুর সম্মুখে লালফুল, রঙীন খেলানা, চক্‌চকে জিনিস ঝুলাইয়া কিংবা কোনরূপ শব্দ করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি। এরূপ জোর করিয়া শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করা অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহাতে শিশুর মস্তিষ্ক অনাবশ্যকরূপে উত্তেজিত হয়। জন্ম গ্রহণের পর কয়েক মাস ধরিয়া শিশুর মস্তিষ্ক বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। তখন এ পৃথিবীর সকলি তাহার নিকট নূতন। এ পৃথিবীর সমুদয় চেতন, অচেতন পদার্থের দাগ তাহার মস্তিষ্কে প্রতি মুহূর্ত্তে পড়িতেছে। সুতরাং বাহির হইতে জোর করিয়া তাহার কার্য্য বাড়াইলে মস্তিষ্কের পুষ্টি না হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হয়। মস্তিষ্কের developmentর কার্য্য বিধাতাই করিতেছে। দোলায়মান খাট বা চেয়ার-দোলায় শিশুকে কখনো শোয়াইবে না। অনবরত স্পন্দন শিশুর মস্তিষ্কের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকারী।

শিশুকে হাতে তুলিয়া লোফালুফি করিবে না।

তাহার চক্ষুর সম্মুখে কোন জিনিস অনবরত নাড়াইবে না।

শিশুকে কোলে করিয়া দুলিবে না।

আগন্তুকদিগকে দেখাইবার জন্য শিশুর ঘুম ভাঙ্গাইবে না, তাহাকে বিরক্ত করিবে না।

শিশুর সম্মুখে শিষ দিবে না, অনবরত বক্‌বক্ করিবে না।

সর্ব্বদা তাহাকে হাসাইতে চেষ্টা করিবেনা।

এই সমুদয় কার্য্যই শিশুর মস্তিষ্ককে অস্বাভাবিক উপায়ে এবং অতিরিক্ত রূপে উত্তেজিত করে। ইহাতে তাহার স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া হইবার সম্ভাবনা। কাহাকেও শিশুকে চুম্বন করিতে দিবে না। যে সে লোককে চুম্বন করিতে দিলে নানা রোগের বীজ শিশুকে আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা।

অকাল প্রসূত শিশু।

অকাল প্রসূত শিশুকে অতিশয় যত্নের সহিত লালন পালন করিতে হয়। তাহার জীবনী শক্তি অত্যন্ত কম থাকে। এই জন্য দেহের স্বাভাবিক তাপ রক্ষা করাই কঠিন হয় এবং খাদ্য পরিপাক ও assimilate করিবার শক্তিও কম হয়। শিশু অকালে জন্মিলে তাহার সমস্ত দেহে তুলা জড়াইয়া, তুলার মধ্যে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিবে। এক মাস পর্য্যন্ত তাহাকে যতদূর সম্ভব গরমে রাখিবে। তুলার বিছানার নীচে গরম জলের ব্যাগ রাখিবে, জল ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় গরম জল ভরিয়া দিবে। এইরূপে একমাস রাখিবার পর অল্প অল্প করিয়া গরম কমাইয়া দিবে। এইরূপ শিশু এত দুর্ব্বল হয় যে, মাতৃ দুগ্ধ চুষিয়া খাইবার শক্তিও থাকে না। মাতার দুগ্ধ গালিয়া একটি বাটিতে রাখিয়া চামচে করিয়া খাওয়াইবে। কিংবা চামচের সহিত পলিতা দিবে, শিশু চুষিয়া খাইবে। মাতার দুগ্ধ যত খাইতে পারিবে ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল। মাতার দুগ্ধ চুষিয়া খাইতে না পারিলে শিশুর উচিত মত ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং যেরূপ পুষ্টি লাভের দরকার তাহা না পাইয়া শিশু ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে সূতিকাগারে মাতার দুগ্ধের সহিত গাধার দুগ্ধ দিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। গাধার দুগ্ধ—মাতৃ দুগ্ধের প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট। গাধার দুগ্ধ পাওয়া না গেলে allentury's milk Food no. 1 প্রথম তিন মাস পর্য্যন্ত, পরে ছয় মাস পর্য্যন্ত no 2 এবং mellin's Food, Glasco শিশুকে দিলে মাতৃ দুগ্ধের অভাব দূর হইবে। বিশুদ্ধ গাভীর দুগ্ধ সহ্য হইলে এই সকল বিলাতী ফুড না দেওয়াই ভাল।

অকাল প্রসূত শিশুকে এক ঘণ্টা কিংবা দেড় ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। ক্রমে বল পাইলে দুই ঘণ্টা পরে দিবে। সুস্থ শিশুর রাত্রে ২।১ বারের বেশী আহারের আবশ্যক হয় না। কিন্তু অপূর্ণ সময়ে প্রসূত দুর্ব্বল শিশুর প্রথম ২।৩ মাস রাত্রে ৩।৪ বার আহারের আবশ্যক হয়। ক্রমে বল পাইলে রাত্রের আহার কমাইয়া দিয়া একবার খাওয়ান অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা পর পর দুধ খাওয়াইয়া রাত্রি ১০ হইতে প্রত্যূষে ৫টা পর্য্যন্ত পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিবে, ইহা

শিশুর স্বাস্থ্যের, পক্ষে যেমন দরকার তাহার মাতার পক্ষেও তেমনি প্রয়োজন। সুস্থ শিশুকে প্রথম হইতেই এইরূপ অভ্যাস করাইবে, কিন্তু অপূর্ণ শিশুর ৩।৪ মাস বয়স হইলে বল পাইলে এইরূপে খাওয়াইবে। অপূর্ণ শিশুর অধিক আহারের আবশ্যক।

আহারের পরিমাণ বয়স অনুসারে ক্রমে বাড়াইবে। প্রথম হইতে অধিক আহার দিলে শিশু পরিপাক করিতে পারিবে না, পরিপাক শক্তি নষ্ট হইতে পারে। অপূর্ণ শিশুকে বেশী নাড়াচাড়া করিবে না। সুস্থ শিশুকে যেরূপে স্নান করান হয়, পরিচ্ছদ পরান হয় অকাল প্রসূত শিশুকে সেরূপে করিবে না, তাহাকে অতি সাবধানে স্নান করাইবে, কাপড় পরাইবে। তাহার হাত, পা, বুক, পিঠে প্রত্যহ সরিষার তৈল এক ঘণ্টা ধরিয়া মালিস করিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ় ও বলশালী হইবে এবং সহজে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় দূর হইবে। এইরূপ শিশুর পক্ষে সরিষার তৈল অত্যন্ত উপকারী। অকালে প্রসূত দুর্ব্বল শিশুর নিদ্রা খুব বেশী হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই সে নিদ্রিত থাকে, এমন কি তাহাকে যথাসময়ে খাওয়ানই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু আহারের সময় তাহাকে যেরূপেই হউক জাগান উচিত। নিদ্রা এবং আহার দুইই তাহার পক্ষে তুল্যরূপে আবশ্যক। অপূর্ণ শিশুর পুষ্টির জন্য আহারের পূর্ব্বে তাহাকে মাখনের ছোট ছোট গুলি চুষিতে দিলে খুব উপকার হয়। সহ্য হইলে এক একবারে ৩।৪টি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মটরের আকারে মাখনের ছোট ছোট গুলি করিয়া তাহাতে milk sugar মাখাইয়া লইলেই মাখনের গুলি প্রস্তুত হইল। milk sugar ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। অল্প অল্প করিয়া সহ্য করান উচিত। অকাল প্রসূত শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে। জন্মিবামাত্র আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা উপযুক্তরূপ যত্ন না লইলে বুদ্ধিহীন এবং বিকলাঙ্গ হইবার খুব সম্ভাবনা। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সকল শক্তি বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন লইতে হইবে। তবে শিশু মানুষ হইবে। নতুবা বুদ্ধিহীন ও বিকলাঙ্গ হইয়া সংসারের ও সমাজের দুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারণেই তাহার জীবন নাশের আশঙ্কা থাকে। কারণ তাহার দৈহিক শক্তি ও যন্ত্রাদি দুর্ব্বল থাকে বলিয়া সামান্য কারণেই অসুস্থ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। যে রোগের আক্রমণ হইতে সুস্থ শিশু ২।১ দিনেই আরোগ্য লাভ করে, অকাল প্রসূত শিশুর তাহাতে জীবন যাইতে পারে। তাহার রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা (Resistance Power) করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং এইরূপ শিশুকে অতি যত্নের সহিত লালনপালন করিতে হয়। দন্তোদ্গমের সময়, টিকা লইবার সময় বিশেষে সাবধানতার সহিত তাহাকে রাখিতে হইবে। আমরা একটি সাত মাসে প্রসূত শিশুর কথা জানি। তাহার প্রত্যেকটি দাঁত উঠিবার সময় ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবন হানির আশঙ্কা হইত। সাধারণতঃ ছয় মাসের মধ্যে সুস্থ শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। কিন্তু অপূর্ণ শিশুকে অত শীঘ্র টিকা দিলে

বিপদের সম্ভাবনা। শিশু বল পাইলে ২॥। ৩ বৎসরে টিকা লইবার উপযুক্ত হয়। চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিয়া এইরূপ শিশুকে টিকা দিবে। অপুর্ণ শিশুর লালনপালনে সর্ব্বদাই চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া চলিলে কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না।

সাধারণতঃ সুস্থ শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার নিয়ম এই :—

	শিশুর বয়স।					
	১ সপ্তাহ	২ হইতে ৩ সপ্তাহ	৪ হইতে ৫ সপ্তাহ	৬ হইতে ১২ সপ্তাহ	৩ হইতে ৫ মাস	৫ হইতে ৯ মাস
২৪ ঘণ্টার মধ্যে কয়বার দুধ খাওয়াইতে হইবে।	১০	৯	৭	৬	৬	৫
দিনে কতক্ষণ পরে খাওয়াইতে হইবে।	২ ঘণ্টা পর পর	২½ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৪ ঘণ্টা
রাত্রে কতবার খাওয়াইতে হইবে।	১	১	১	•	•	•

অকাল প্রসূত শিশুর পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। প্রথম ৪।৫ মাস তাহাকে ইহাপেক্ষা অধিকবার খাওয়াইতে হয়। একটি সাতমাসে প্রসূত শিশুকে প্রথম চারি, পাঁচ মাস প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিতে হইত, অল্পক্ষণের জন্য মাত্র পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে পারা যাইত। সে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০।১১ বার খাইত। এই শিশু এত দুর্ব্বল হইয়া জন্মিয়াছিল যে মাতৃস্তন্য টানিয়া খাইতে পারিত না। মাতৃ দুগ্ধ অতি সামান্য খাইত বলিয়া তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না, এই কারণে তাহাকে কৃত্রিম দুগ্ধ দুই ঘণ্টা পর পর দিতে হইত। ১০।১১ বার আহারের কমে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। সপ্তম অষ্টম মাস হইতে তাহার রাত্রির আহার ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ক্রমে ১০।১১ মাসে একটু বল পাইলে তিন ঘণ্টা পর পর খাওইবার অভ্যাস করান হইয়াছিল এবং রাত্রি ১০ টার পর আর আহার দেওয়া হইত না। সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উপরোল্লিখিত নিয়ম সাধারণতঃই খাটে। বিশেষ স্থলে বিশেষ নিয়মে খাওয়াইতে হয়। মাতা প্রত্যেক শিশুর অবস্থা বুঝিয়া সেইরূপে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন।

দন্তোদ্গম।

"খোকার দাঁত উঠেছে।"—প্রত্যেক নবীনা মাতাই কি আনন্দোপূর্ণ গর্ব্বের সহিত এই শুভ সংবাদটি পরিবারের সকলের নিকট জ্ঞাপন করেন। খোকার পিতা প্রবাসে থাকিলে তিনি এই সংবাদটি শুনিয়া কত

আনন্দিত হন। নরম মাড়ি হইতে সাদা মুক্তার মত দাঁত বাহির হইতে আরম্ভ হইলে মাতার হৃদয় কি অননুভূত আনন্দে উল্লসিত হয়। কিন্তু ইহার সহিত যে বিপদও জড়িত আছে তাহা অনেক নবীনা মাতাই জ্ঞাত নহেন। দাঁত উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পালন সম্বন্ধে মাতার কাজ কত বাড়িয়া যায়। শিশুর আহারের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, প্রত্যহ দাঁত মাজিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়। আবার দুর্ব্বল শিশু হইলে প্রত্যেকটি দাঁত উঠিবার সময়ই শিশু পীড়িত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং দাঁত উঠিতে আরম্ভ হইলেই মাতাকে সতর্ক হইতে হইবে।

দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে মাড়ি ফুলিয়া শক্ত হয়। তা'রপর দাঁত বাহির হয়। শিশুর দাঁত সচরাচর ৬।৭।৮ মাসে উঠিতে আরম্ভ হয়, কখনও কখনও ৪র্থ কি ৫ম মাসে উঠিয়া থাকে। (১) অকালে প্রসূত শিশুর দাঁত ১১শ মাসে প্রথম উঠিতে দেখা গিয়াছে। দুইটি করিয়া দাঁত এক সঙ্গে উঠে। সচরাচর নীচের সম্মুখের দুইটি বাহির হয়, ক্রমে কিছু দিন পর পর অন্য দাঁত গুলি বাহির হইয়া দুই কিংবা আড়াই বৎসরের মধ্যে কুড়িটি দাঁত উঠিয়া দাঁত উঠা শেষ হইয়া যায়। দাঁত উঠা স্বাভাবিক অবস্থা। সুতরাং সুস্থ শিশুর দাঁত উঠিতে বিশেষ কোনই অসুখ হয় না। শিশু যদি পূর্ব্ব হইতেই মাতৃ দুগ্ধে কিংবা উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যে, বিশুদ্ধ বাতাসের মধ্যে যত্নের সহিত লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে তবে তাহার দাঁত উঠিতে কোন কষ্টই প্রায় হয় না। সামান্য অসুখ যাহা হয় তাহা শীঘ্রই সারিয়া যায়। কিন্তু অকাল প্রসূত, দুর্ব্বল রুগ্ন এবং অযত্নে পালিত শিশুর দাঁত উঠিবার সময় জীবন সংশয় পীড়া হয়। এ সময়ে সচরাচর সুস্থ শিশুদের পেটের অসুখ, সর্দ্দি, জ্বর, কাসি, আমাশয়, পিপাসা প্রভৃতি পীড়া হয়। প্রথম হইতেই এই সকল পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে, নতুবা প্রথমে অবহেলা করিলে পরে পীড়া বৃদ্ধি হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে। (২) দাঁত উঠিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে শিশুর মুখ-গহ্বরের বিশেষ যত্ন লইবে। মাড়ি ফুলিয়া ব্যথা হইলে ধীরে ধীরে মাড়ি ঘসিলে শিশুর আরাম বোধ হইতে পারে এবং দাঁত উঠিবার পক্ষে সাহায্যও হয়। মুখের ভিতর ফুলিয়া উঠিলে ঠাণ্ডা জল একটু একটু করিয়া পান করিতে দিলে শিশু আরাম পায়। এই সময় শিশুর কোষ্ঠ যাহাতে নিয়মিত রূপে পরিষ্কার হয় তাহা দেখিবে, নিয়মিত সময়ে তাহাকে আহার করাইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার ঘুম যাহাতে হয় তাহা করিবে।

শিশুকে চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতীত কখনও দাঁত উঠিবার কোন টোট্‌কা ঔষধ কিংবা teething powder দিবে না। এই সময়ে তাহার যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে দিকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যদি তা'র মুখ দিয়া ক্রমাগত লালা নির্গত হইতে থাকে তাহা হইলে বুকের কাপড় সর্ব্বদা ভিজা থাকে বলিয়া ব্রঙ্কাইটিস হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে শিশুর কাপড় ভিজা না থাকে—সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

শিশুর দাঁত প্রতিদিন পরিষ্কার করিবে। দুধে দাঁত ভাল হইলে তবে স্থায়ী দাঁত ভাল হইবে। দাঁতে একটু ময়লা বসিলেই তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবে। দাঁতে পোকা লাগিবার

সম্ভাবনা কিংবা ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিলে তৎক্ষণাৎ দন্ত চিকিৎসককে দেখাইবে। প্রত্যেক মাতাই মনে রাখিবেন যে, দাঁত খারাপ হইলে শিশুর স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া যায়। এক বৎসরের হইলেই শিশুর দাঁত প্রত্যহ মাজিয়া দিবে এবং সেই বয়সের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে। শিশুর দাঁত ভাল করিয়া রক্ষা করিতে হইলে :—

(১) তাহার স্বাস্থ্য ভাল রাখিবে।

(২) দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্দ্ধন ও পুষ্টির জন্য শিশুর জন্ম গ্রহণের পর কয়েক মাস এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত উপযুক্ত পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য দিবে।

(৩) শিশুকে কখনো dummy দিবে না।

(৪) শিশুকে এরূপ খাদ্য দিবে—যাহাতে তাহার চোয়াল এবং মুখ নাড়িয়া খাইতে হয়। ভাল করিয়া চিবাইয়া খাওয়া শিশুকে অভ্যাস করাইবে। শিশুকালের অভ্যাস কখনও ভুলিবার নয়।

(৫) শিশুকে কখনো লম্বা নল সংযুক্ত বোতলে খাওয়াইবে না। বোতলে মাতৃস্তন্যের বোঁটার ন্যায় বোঁটা থাকিবে। শিশু মাতৃস্তন্য যেমন টানিয়া চুষিয়া খায়, বোতলের বোঁটাও তেমনি করিয়া টানিয়া চুষিয়া খাইবে। দাঁত ও চোয়াল—ব্যবহারের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। রীতিমত ব্যবহার করিলে তবে তাহারা দৃঢ় ও কার্য্যকরী হইবে।

(৬) শিশুকে তাহার খাদ্য ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে শিখাইবে। দেখিবে—শিশু যেন অতি তাড়াতাড়ি কিংবা অতি আস্তে না খায়। দাঁত উঠিলে তাহাকে এমন খাদ্য দিবে—যাহা খুব ভাল করিয়া দাঁত দিয়া চিবান দরকার। দাঁতের ব্যবহারের জন্য শিশুকে কঠিন খাদ্য—যেমন রুটি টোষ্ট, শুষ্ক বিস্কুট দিবে। কঠিন খাদ্য ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইলে দাঁতের ময়লা দূর হয়, দাঁতের ক্ষয় হয় না, দাঁত বেশ সমান হইয়া বাহির হয়।

(৭) নরম খাদ্যের টুকরা দাঁতে লাগিয়া থাকিলে দাঁতের ক্ষয় হয়। দাঁতের উপর হইতেই ক্ষয় আরম্ভ হয়, ভিতর হইতে নহে। দুইটি দাঁতের মাঝখানে কিংবা দাঁতের উপরি ভাগ হইতে ক্ষয়ের সূত্রপাত হইয়াছে দেখা যায়।

(৮) প্রত্যহ একবার দাঁত পরিষ্কার করিয়া দিবে। দুইবার দিতে পারিলে আরো ভাল হয়। দুধে দাঁত ভাল হইলে পোকার না থাইলে স্থায়ী দাঁতও ভাল হইবে। রাত্রিতে এমন কোন খাদ্য শিশুকে দিবে না—যাহার অংশ দাঁতের ফাঁকে লাগিয়া থাকিতে পারে। খাদ্যাংশ সমস্ত রাত্রি দাঁতে লাগিয়া থাকিয়া পচিয়া যায়। ইহাতে দাঁতের ঘোরতর অনিষ্ট হয়, দাঁতে পোকা লাগিয়া পড়িয়া যায়।

(১) শীঘ্র দাঁত উঠিলে সে দাঁত তত মজবুত হয় না। কারণ বিলম্বে উঠিলে শিশুর দেহ ততদিন পুষ্ট হইতে থাকিবে। শিশুর দেহ পুষ্ট হইবার পর দাঁত উঠিলে সে দাঁত অধিকতর দৃঢ় হয়।

(২) তাড়াতাড়ি দাঁত উঠিলে শিশু পীড়িত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পায়। দাঁত উঠিবার সময় এইরূপ শিশুদের পুষ্টিকর অথচ লঘু খাদ্য দিবে। দুগ্ধে জল মিশাইয়া দিবে, ভারি দুধ এ সময় হজম করিতে পারিবে না। দাঁত উঠিবার সময় যে পেটের অসুখ হয় তাহা ভালই। ৬।৭ বার পর্য্যন্ত হইলে কোন

ভয় নাই। তাহার অধিক হইলেই বন্ধ করিয়া দিবে। দাঁত উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে, মাড়ি ফুলিয়া লাল এবং শক্ত হইয়াছে অথচ দাঁত বাহির হইতেছে না এরূপ হইলে চিকিৎসক দ্বারা মাড়ি চিরিয়া দিলে অনেক সময় উপকার হয়। নিজেরা কখনো চিরিয়া দিবে না, তাহাতে বিপদ ঘটিতে পারে। দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশুর তড়কা হয়। তড়কা হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকিবে। যতক্ষণ চিকিৎসক না আসেন ততক্ষণ শিশুর মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়া স্পঞ্জ করিয়া হাতে সহ্য গরম জলে শিশুর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া তৎক্ষণাৎ গা শুষ্ক কাপড়ে মুছিয়া গরম কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবে, মাথাটি কিন্তু সর্ব্বদা ঠাণ্ডা রাখিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে লবণ জলের পিচকারী দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া দিবে। দাঁত উঠিবার সময় শক্ত জিনিস, যেমন টোষ্ট রুটির টুক্‌রা, আকের টুকরা প্রভৃতি চিবাইতে দিলে দাঁত শীঘ্র উঠিবার সাহায্য হয়। সাধারণতঃ যে শিশুর দাঁত উঠিবার সময় যত dribble করে, তার তত কম কষ্ট হয়। এ সময়ে অনেক শিশুর মাথার মধ্যস্থলে একরকম scurt হয়, তাহা শুধু চিরুণি দিয়া কখনো আচড়াইবে না, বেশ করিয়া তেল দিয়া নরম করিয়া ফ্ল্যানেল দিয়া ঘসিয়া উঠাইয়া দিবে।

টিকা।

সাধারণতঃ সুস্থ শিশুর এক মাস বয়স হইলেই তাহাকে টিকা দেওয়া হয়। সচরাচর ছয় মাসের মধ্যে টিকা দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু দুর্ব্বল, রুগ্ন, অকাল প্রসূত শিশুদের কখনো এত অল্প বয়সে টিকা দিবে না। তাহারা বল পাইলে চিকিৎসকের দ্বারা দেহ পরীক্ষা করাইয়া তবে টিকা দিবে। এইরূপ শিশুর দেহ টিকা লইবার উপযুক্ত হইয়াছে—চিকিৎসক বলিলে তবে তাহাকে টিকা দিবে।

টিকা দিবার পর সুস্থ শিশুর বেশী কোন কষ্ট না। ৫ম হইতে নবম দিনে টিকা ফুলিয়া উঠে, ২১ দিন পর্য্যন্ত টিকা ফোলা, ব্যথা, যন্ত্রণা থাকে। তাহার পর হইতে কমিতে থাকে। টিকার স্থানটি সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে, যেন কোন ময়লা বসিতে না পারে কিংবা আঘাত না লাগে। টিকা, ঢাকিয়া রাখিবার জন্য Vaccinating Guard কিনিয়া কিংবা তৈয়ার করিয়া টিকা ঢাকিয়া রাখিবে। কলিকাতার Smith Stanistreet, Frank Ross প্রভৃতির দোকানে ইহা Guard বিক্রয়ার্থ থাকে। ইহা শিশুর পক্ষে নিরাপদজনক এবং আরামদায়ক। ইহা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে শিশুর টিকায় হাত দিবার অথবা আঁচড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা থাকে না, টিকা বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। টিকার স্থানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিবে। টিকাতে ময়লা ধুলা লাগিলে লাল হইয়া ফুলিয়া অত্যন্ত কষ্ট দেয়। সুতরাং ইহা খুব পরিষ্কার রাখিবে। টিকাতে কখন কোন মলম, কি কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ লাগাইবে না। প্রথম আট দিন টিকার স্থানটি বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, যেন শিশু তাহা নখ দিয়া আঁচড়াইয়া না দিতে পারে কিংবা কোন আঘাত না লাগে। টিকা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিলে কিংবা খুব কষ্টদায়ক হইলে জলে কয়েক ফোঁটা

Condy's fluid দিয়া তাহাতে একটি পরিষ্কার রুমাল কিংবা ন্যাকড়া ভিজাইয়া ভাঁজ করিয়া টিকার স্থানে বসাইয়া রাখিলে আরাম পায়। ন্যাকড়াটি সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিবে। বেশী ফুলিয়া উঠিলে, লাল হইলে, খুব জ্বর হইলে, দেহের বিভিন্ন স্থানে বসন্ত বাহির হইলে চিকিৎসক ডাকিবে। এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক না হইলেও প্রায়ই টিকা দিলে শিশু এতটা অসুস্থ হয় না। সুতরাং এ অবস্থা কখনও অবহেলা করিবেনা। শিশুর টিকার বীজ—জানিত স্থান হইতে আনিবে এবং চিকিৎসক দ্বারা টিকা দেওয়াইবে। যে সে লোক দ্বারা যে সে স্থান হইতে টিকার বীজ আনিবে না। পূর্ব্বে মানুষ এবং গরু—বাড়ীতে আনিয়া তাহাদের বীজ লইয়া টিকা দেওয়া হইত। এখন টিকার বীজ মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল প্রভৃতি বিখ্যাত হাঁসপাতাল হইতে কিনিতে পাওয়া যায়। সেই বীজ আনিয়া চিকিৎসককে দিয়া টিকা দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। টিকা দিবার পর দেখিবে যে স্নানের সময় সে স্থানটি কেহ যেন ধুইয়া না দেয়। শীতকালই টিকা দিবার প্রশস্ত সময়, বর্ষা কিংবা গ্রীষ্মকালে কখনও টিকা দিবে না, কারণ এ সময়ে ঘা শীঘ্র শুকায় না।

(ক্রমশঃ)

সূর্য্য-রশ্মির সহিত শারীরিক সম্বন্ধ।

[ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস]

—*—

বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে আমাদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিরও ব্যত্যয় হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণের ঔষধপ্রকরণ পদ্ধতি অনেক সময় ইংরাজি শিক্ষিত কোন কোন করিরাজ অথবা শিক্ষিত রোগী বা তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক নিজেদের বুদ্ধি প্রাখর্য্য অবলম্বনে সহজসাধ্য করিয়া ফেলেন। তাহাতে যে ঔষধের গুণের কেবল তারতম্য হয়—তাহা নহে, একেবারে গুণহীন হইয়াও যায়—অর্থাৎ সে ঔষধের উপকারিতা শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটী প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিব। এই প্রক্রিয়াটী আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য, আয়ু বৃদ্ধির জন্য, রোগ আরোগ্যের জন্য ও নির্ব্যাধি হইবার জন্য বিশেষ উপকারী। ইহা অতি সহজসাধ্য হইলেও অনেকে ইহা উপেক্ষা করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় কোন কোন ঔষধ সূর্য্যপক্ক করিবার ব্যবস্থা আছে। উহা ব্যয়-সাধ্য নহে, কিন্তু একটু সময় সাধ্য বলিয়া অনেকে সূর্য্যপক্ক স্থলে অগ্নিপক্ক করিয়া কাজ সারেন। তাঁহারা মনে করেন যে, তাপ হইলেই হইল। সূর্য্যাতপ ও অনলাতপের প্রভেদ তাঁহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে স্থান পায় না। তাঁহারা মনে করেন যে, কতক্ষণ ধরিয়া রৌদ্রে

উত্তপ্ত করিব ?—তদপেক্ষা অত্যল্পকাল মধ্যে অগ্নিতে অতি সহজে উত্তপ্ত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের একটু বিবেচনা করা উচিত যে, যদি কেবল তাপেরই প্রয়োজন হইত তাহা হইলে মহান্ ধীশক্তিসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য-ঋষিগণের বিশাল গবেষণাপূর্ণ ও চিন্তাসাগরোদ্ভূত শাস্ত্রসমূহে সূর্য্যপক্কের পরিবর্ত্তে কেবল উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থাই উল্লেখ থাকিত। এ স্থলে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু সম্ভব প্রাচীন পদ্ধতির সমর্থন করিয়া একটু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা বুঝিয়াছি—তাহারই উল্লেখ করিতেছি, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যাহা প্রবেশ করিয়াছে—তাহাই প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। তবে কথাটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে কি না বলিতে পারি না।

যে সকল উপকরণে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাদের কোনটী ঔষধ ও কোনটী অনুপান বা Medium। ঔষধ আরোগ্যকারী এবং অনুপান উহার শক্তিবর্দ্ধক। এস্থলে অবশ্য উল্লেখ করা উচিত যে, কেবল অনুপান শক্তিবর্দ্ধক নহে অনুপান সম্মিলনে মর্দ্দন ও আলোড়নই প্রকৃত শক্তিবর্দ্ধক; যেস্থলে সূর্য্যপক্কের ব্যবস্থা আছে সেস্থলে তাপালোক সমন্বিত সূর্য্যরশ্মিই (কেবল উত্তাপ নহে) ঔষধ এবং ঘৃত বা তৈল বা অন্য কোন পদার্থ যাহাকে আমরা ঔষধ মনে করি সেটী অনুপান বা Medium.—কেহ হয়ত বলিবেন, অগ্নিরও ত তাপ ও আলোক আছে। সত্য বটে, কিন্তু অগ্নির আলোক ও সূর্য্যালোক পীত ও লোহিত মিশ্রিত এবং সূর্য্যালোক শ্বেত অর্থাৎ সপ্তবর্ণ সমন্বিত। এই সপ্তবর্ণের রশ্মির দ্বারা ইথরের (Ether) যে প্রকম্পন হয় উহাও একরূপ নহে, উহাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ইথর সর্ব্বব্যাপী, এই প্রকম্পনও সর্ব্বব্যাপী। এই প্রকম্পনের রোগনাশিকা শক্তি আছে। লোহিত রশ্মি-মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে অহিতকর। সপ্তবর্ণ সমন্বিত সূর্য্যরশ্মির মধ্যে যে লোহিত রশ্মি আছে উহাও মস্তিষ্কের পক্ষে অহিতকর। তবে আর ছয়প্রকার রশ্মির সহিত মিলিত থাকায় উহার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা কিছু লাঘব হয়। সেইজন্য বোধ হয় সৃষ্টকর্ত্তা আমাদের মস্তক কেশগুচ্ছ দ্বারা আবৃত করিয়াছেন। সূর্য্যালোকের অন্যান্য গুণমধ্যে ব্যাধিবীজবিনাশিনী (Germicide) ও শক্তিবর্দ্ধিনী গুণদ্বয় আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ও রোগ আরোগ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ডায়োজিনিস্ (Deogines) তাঁহার বার্দ্ধক্যে শক্তিবর্দ্ধনার্থ প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অনাবৃত গাত্রে সূর্য্যাতপে অবস্থান করিতেন। গ্রীক পণ্ডিত হিপোক্রেটিস্ শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখিবার জন্য মধ্যাহ্ন আহারের পর এক ঘণ্টা কাল সূর্য্যাতপে অবস্থানের ব্যবস্থা দিতেন। বৃদ্ধ প্লিনি ও তাঁহার পুত্র উভয়েই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সূর্য্যাতপে থাকিতেন। জনৈক ফরাসী চিকিৎসক তাঁহার এক শিশু রোগীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, শিশুকে পল্লীগ্রামে লইয়া যাও এবং রৌদ্রে দগ্ধ কর। আহারের পর সূর্য্যাতপ গ্রহণ আমাদের দেশেও বহুপ্রচলিত। এখনও পল্লীগ্রামস্থ অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আহারের পর রৌদ্র পোহাইয়া থাকেন। সূর্য্যাতপ গ্রহণকালে মস্তক ও মেরুদণ্ড আবৃত থাকা আবশ্যক, এবং শরীর অনাবৃত বা পাংলা

উড়ানি দ্বারা আবৃত রাখিতে হয়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় শরীর সর্ব্বদাই আবৃত থাকে এবং মস্তক অনাবৃত থাকে। এ অবস্থায় সূর্য্যাতপ অহিতকর বই হিতকর নহে। আবার দেখুন ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি দেশব্যাপক রোগ সমূহ, যাহাদের কোনটী না কোনটী প্রায় প্রতি বৎসরই দেখা যায়, সেগুলি সূর্য্যের দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় এবং ৯ই বা ১০ই চৈত্রের পর হইতে অর্থাৎ যখন সূর্য্য বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে কর্কট ক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন উক্ত দেশব্যাপক বা epidemic পীড়া সমূহ অন্তর্হিত হয়। আবার ভাদ্রপদের নবম বা দশম দিবসের পর হইতে অর্থাৎ যখন সূর্য্য আবার বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে মকরক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে সেইকালে নানাপ্রকার ব্যাধির অভ্যুদয় দেখা যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে সময়ে সূর্য্য আমাদের সন্নিকটে থাকে সে সময় রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়া যায় এবং যে ঋতুতে সূর্য্য দূরবস্থিত থাকে সে সময় নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আরও একটী কথা প্রচলিত আছে যে, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি ও দিবসে উপশম হয়। ইহা দ্বারাও অনুমিত হয় যে, দিবালোকে রোগের উপশম ও উহার অভাবেই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আঠারো।

(১৮)

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

—:০:—

দশের (১০) পর, আট (৮) আরও, বোধ হয় এইরূপেই সংখ্যাবাচক আঠার (১৮) শব্দের উৎপত্তি। ক্রমে একটু মহা-প্রাণ উচ্চারণে সেই "আটারো" শব্দটী, "আঠারো"য় পরিণত হইয়াছে। এই আঠারো সংখ্যাটীর উপর আর্য্য ঋষিদের ঝোঁকটা কিছু বেশী ছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথাটা আমি অতি সংক্ষেপে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

পাঠকগণ মনে করিতে পারেন—এরূপ প্রবন্ধ "আয়ুর্ব্বেদে" স্থান পাইল কেন? আমার উত্তর—আয়ুর্ব্বেদও আঠারোকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হিন্দুর সকল শাস্ত্রই "আঠারো" লইয়া অধিক মাত্রায় নাড়াচাড়া করিয়াছেন। প্রথমেই দেখুন—হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রের, প্রাচীন ইতিহাসের নাম "পুরাণ"। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে বৈদিকধর্ম্ম যখন লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল,

ধর্ম্মের আমূল সংস্কার কল্পনায়—তখনই "পুরাণ" শাস্ত্রের সৃষ্টি। নূতন মতকে পাছে "নূতন" বলিয়া ধিক্কৃত হইতে হয়, সেই জন্যই সেই নূতন শাস্ত্রের "পুরাণ" নাম রাখা হইয়াছিল। "পুরাণ" পুরাতন শব্দেরই অপভ্রংশ। 'পুরাণ' বৌদ্ধ-বিপ্লব হইতে হিন্দু ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিল। বহু দেবদেবীর অবতারণা করিয়া, বহু বংশের ইতি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া, "পুরাণ" ভারতে নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। পুরাণের উপদেশে, গাথা-কৌশলে, রচনা গৌরবে, সমাজের গতি ফিরিয়াছিল। এ হেন মহাশাস্ত্র "পুরাণ"—তাহার সংখ্যা মাত্র আঠারো খানি।

তাহার পর ধরুন—শালগ্রাম। হিন্দুর বিবাহ বলুন, উপনয়ন বলুন, শ্রাদ্ধ বলুন, ব্রত, পূজা বলুন, সকল কাজেই শালগ্রাম শিলার প্রয়োজন। হিন্দু গৃহস্থের একমাত্র আরাধ্য এই শালগ্রাম শিলাও সংখ্যায় আঠারোটী।

পাপীকে পাপ পথ হইতে ফিরাইবার জন্য—সকল জাতির মহাকবিই প্রকৃতির বিশাল চিত্রপটে নরকের রুদ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, হিন্দুমতে সেই নরকের সংখ্যাও আঠারোটী।

এই জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরাট কেন্দ্র ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাদের সংখ্যাও আঠারোটী। যথা;—১। সংস্কৃত। ২। প্রাকৃত। ৩। উদীচী। ৪। মহারাষ্ট্রী, ৫। মাগধী, ৬। অর্দ্ধ মাগধী, ৭। শকাভীরী, ৮। শ্রবন্তী, ৯। দ্রাবিড়ী, ১০। উৎকলী ১১। পাশ্চাত্য, ১২। প্রাচ্য, ১৩। বাহ্লিক, ১৪। আবন্তিক, ১৫। দাক্ষিণাত্য, ১৬। পৈশাচী ১৭। কূর্চ্চী (আবন্তী) ১৮। শৌরসেনী। যিনি এই সকল ভাষায় গূঢ় রহস্য অবগত ছিলেন, সেই "সাহিত্য দর্পণ"কার বিশ্বনাথের গৌরবময় বিশেষণ—"অষ্টাদশ ভাষা যার বিলাসিনী ভুজঙ্গ"।

হিন্দু চিরদিন মুক্তি পিপাসু। মুক্তি তাহার জীবনের লক্ষ্য। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্যই—তাহার জপ, তপ, সাধনা। কিন্তু সেই মুক্তি পথের বিঘ্নও পুত্র কলত্রাদি লইয়া ১৮টী! "পুরুষোত্তম"—ভারতের পুণ্য তীর্থ, এই পুরুষোত্তমে গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দেখিতে হইলে, ভক্তকে ১৮টী নালা পার হইতে হয়।

প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সান্ত্বনাময় সহানুভূতি জানাইয়া লোকে বলিয়া থাকে—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।"

দীর্ঘ সূত্রির কলঙ্কে কটাক্ষ করিয়া, লোকে বলে—"তোমার আঠারো মাসে বছর!"

হিন্দুর মহাকাব্য "মহাভারত।" এই অপূর্ব্ব ইতিহাসের রচয়িতা—স্বয়ং ব্যাসদেব। ব্যাসদেবের সঙ্গে ১৮ সংখ্যার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—

১। মহাভারতের পর্ব্ব ১৮টী।

২। মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের যে যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, সে যুদ্ধের ব্যাপ্তি-কাল ১৮ দিন।

৩। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে যে সকল সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল—তাহাদের সংখ্যা ১৮ অক্ষৌহিনী।

৪। কৌরব কুল নির্ম্মূল হইলেও ধৃতরাষ্ট্র বাঁচিয়াছিলেন—১৮ বৎসর।

৫। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অবসানে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিয়াছিলেন—১৮×২=৩৬ বৎসর।

৬। মহাভারতের অন্তর্গত 'শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা"—১৮ অধ্যায়ে বিভক্ত।

৭। মহাভারতের আর একটী নাম—"জয়"। * এই জন্যই প্রত্যেক পর্ব্বের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ দেখা যায়—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ॥

লঘু আর্য্য সিদ্ধান্তের মতে—"ক" হইতে "ঞ" পর্য্যন্ত অক্ষর গুলি, যথাক্রমে—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০,—এই কয়টী সংখ্যা বাচক। "ট" হইতে "ন" পর্য্যন্ত বর্ণগুলিও যথাক্রমে দশটী সংখ্যার বোধক। য, র, ল, ব প্রভৃতি অক্ষর গুলির দ্বারা—যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি সংখ্যা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে, "জ" ও "য়" এই দুইটী বর্ণ ৮ ও ১ সংখ্যার দ্যোতক। এক্ষণে "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" এই বিধানে "জয়" শব্দটী (১৮) আঠারো সংখ্যার বোধক হইতেছে! অতএব দেখা যাইতেছে,—মহাকাব্য মহাভারতে কেবল "আঠারোর"ই লীলা!!

ভরত শাস্ত্রের মতে—৬ রাগের প্রত্যেকের ৩টী মহাশক্তি, এই হিসাবে প্রথমে ১৮ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে কলাবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক একটী রাগিণীর এক একটী সখী কল্পিত হয়। মূল রাগিণী ও সখী লইয়া—ক্রমে ৩৬ রাগিণীর উৎপত্তি। এখন রাগিণী-সঙ্করত্ব দোষে—অনেক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

তন্ত্রেও ১৮র আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—তারিণী তন্ত্রে—

"প্রতিমাষ্টাদশাঙ্গুলা ন্যূনাধিক্যং ন কারয়েৎ।
অজ্ঞানেনাপি মোহেন যদি কুর্য্যান্নরাধমঃ।
প্রতিষ্ঠা বিফলা তস্য পূজনান্নফলং ভবেৎ॥"

মৃত্তিকা নির্ম্মিত লিঙ্গ প্রতিমা—১৮ অঙ্গুলি প্রমাণ করা উচিত। ইহার কম কিম্বা বেশী করিলে প্রতিষ্ঠার ফল পাওয়া যায় না।

মাতৃকা মন্ত্রের অক্ষর ১৮টী।

"জপেন্মন্ত্রী মাতৃকায়া মন্ত্রমষ্টাদশাক্ষরীং।"
তাং তং।

সিদ্ধি লিপ্সুর মন্ত্রস্থান ১৮টী। যথা—১। গোষ্ঠ, ২। দেবালয়, ৩। শ্মশান, ৪। কান্তার, ৫। পর্ব্বত, ৬। চতুষ্পথ, ৭। নদীতট, ৮। গোগৃহ, ৯। গুহা। ১০। মহাপীঠ, ১১। তীর্থ, ১২। মঙ্গল কুট্টক, ১৩। শূন্য, ১৪। কুশাবর্ত্ত, ১৫। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ১৬। বিল্বমূল, ১৭। নির্জ্জন, ১৮। মরু।

পূজার প্রিয়-পুষ্প ১৮টী,—১। কোকনদ ২। পুণ্ডরীক, ৩। অর্ক, ৪। অপরাজিতা, ৫। বন্ধুক, ৬। কর্ণিকার, ৭। করবীর, ৮। বক। ৯। জাতী, ১০। বকুল, ১১। ক্ষৌমপুষ্প, ১২। নাগকেশর, ১৩। কদম্ব, ১৪। যূথিকা, ১৫। জয়ন্তিকা, ১৬। কুরুবক, ১৭। মল্লিকা, ১৮। ওড্র (জবা)।

দান পদার্থও ১৮টী। ১। অন্ন, ২। জল, ৩। শয্যা, ৪। গৃহ। ৫। ভূমি, ৬। ক্ষীর, ৭। বস্ত্র, ৮। ভেষজ, ৯। মধু, ১০। ফল, ১১। স্বর্ণ, ১২। ধেনু, ১৩। কন্যা, ১৪। আসন, ১৫। ছত্র, ১৬। পাদুকা, ১৭। তৈজস, ১৮। বিদ্যা।

মন্ত্র স্থাপনের পত্র ১৮টী। ১। পর্ণ, ২। বিল্ব, ৩। তুলসী, ৪। মান, ৫। বট, ৬। অশ্বত্থ, ৭। প্লক্ষ, ৮। উড়ুম্বর, ৯। হরিদ্রা, ১০। কদলী, ১১। ভূর্জ্জ, ১২। তাল, ১৩। হিন্তাল, ১৪। কচ্চী, ১৫। শাল, ১৬। পলাশ, ১৭। তমাল, ১৮। পদ্ম।

সিদ্ধির উপায় ১৮টী। ১। ত্যাগ, ২। শৌচ, ৩। আচার, ৪। প্রক্ষালন, ৫। স্নান, ৬। যজ্ঞ, ৭। আচমন, ৮। পূজা, ৯। নিবেদন, ১০। বলি, ১১। ভক্তি, ১২। জপ, ১৩। স্তোত্র, ১৪। তর্পণ, ১৫। সত্য, ১৬। দৈন্য, ১৭। বিশ্বাস, ১৮। শ্রবণ।

মহাপাতক ১৮টী। ১। অভক্ষ্য ভক্ষণ, ২। পরদারাভিগমন, ৩। প্রতারণা, ৪। দস্যুতা, ৫। হত্যা, ৬। বিশ্বাসঘাতকতা, ৭। সুরাপান, ৮। অসত্য, ৯। লোভ, ১০। গুরুনিন্দা, ১১। হিংসা, ১২। কুৎসা, ১৩। কাকু, ১৪। ধর্ম্মগ্লানি, ১৫। আত্মহা, ১৬। অবমাননা, ১৭। পীড়ন, ১৮। শুক্র বিক্রয়।

মহাশক্তি ১৮টী, দশমহাবিদ্যা ও অষ্ট নায়িকা। ব্যাধি—যমের অনুচর। সেই ব্যাধির সংখ্যা—১৮ কোটি। যথা—

"অষ্টাদশ কোটিব্যাধি অনুচর যা'র,
সেই যম—হের বৎস! সম্মুখে তোমার।"

আমাদের আয়ুর্ব্বেদেও ১৮র প্রভাব বড় কম নহে।

রোগের উপসর্গ ১৮টী। ১। দাহ, ২। কম্প, ৩। বমন, ৪। প্রলাপ, ৫। মূর্চ্ছা, ৬। হিক্কা, ৭। শ্বাস, ৮। কাস, ৯। অতিসার, ১০। তন্দ্রা, ১১। অরুচি, ১২। স্বেদ, ১৩। তৃষ্ণা, ১৪। জড়তা, ১৫। বিবন্ধ, ১৬। আগ্মান, ১৭। ভ্রম, ১৮। আক্ষেপ।

ক্ষয় রোগ ১৮ প্রকার।

কুষ্ঠ রোগ ১৮ প্রকার।

সূতিকা গৃহে—শিশু মাতৃকা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে—১৮ দিনেই প্রায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। *

ঠিক ১৮ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের গর্ভ হইলে—তাহার এবং শিশুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

ভবেত্তু যা গর্ভবতী কুমারী
কুমারিহষ্টাদশ বর্ষকালে।
সা মৃত্যু মায়াতি ততশ্চ বালঃ
উবাচ মুগ্ধে। জতুকর্ণ ইত্থং॥

হরি চন্দ্র।

ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ।

ভূনিম্ব দারু দশমূল মহৌষধাব্দ
তিক্তেন্দ্র-বীজ ধনিকেভকণা কষায়ঃ।
তন্দ্রা প্রলাপ কসনারুচি দাহ মোহ
শ্বাসাদি যুক্ত মখিলং জ্বর মাশু হন্তি॥

১। চিরাতা, ২। দেবদারু, ৩। বেলছাল, ৪। শ্যোনাছাল, ৫। পারুল ছাল, ৬। গাম্ভারী ছাল, ৭। গণিয়ারী ছাল, ৮। শালপাণি, ৯। চাকুলে, ১০। কন্টিকারী, ১১। বৃহতী, ১২। গোক্ষুর, ১৩। শুঁঠ, ১৪। মুথা, ১৫। কট্‌কী, ১৬। ইন্দ্রযব, ১৭। ধনে, ১৮। গজপিপুল;—এই ১৮ খানি দ্রব্যের কাথ পান করিলে—তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি যুক্ত সমস্ত জ্বর শীঘ্র প্রশমিত হয়।

* বাল-তন্ত্র দেখ।

অষ্টাদশাঙ্গঃ।

দশমূল শটী শৃঙ্গী পৌষ্করং স দুরালভং।
ভার্গী কুটজ বীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী।
অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাত জরাপহঃ।
কাস-হৃদ্ গ্রহ-পার্শ্বার্ত্তি শ্বাস-হিক্কা বমী হরঃ।

১। বেল, ২। শোনা, ৩। পারুল, ৪। গাম্ভারী, ৫। গণিয়ারী, ৬। শালপাণি, ৭। চাকুলে, ৮। গোক্ষুর, ৯। বৃহতী, ১০। কণ্টিকারী, ১১। শটী, ১২। কাঁকড়া-শৃঙ্গী, ১৩। কুড়, ১৪। দুরালভা, ১৫। বামন হাটী, ১৬। ইন্দ্রযব, ১৭। পলতা, ১৮। কট্‌কী;—এই ১৮ দ্রব্যের কাথ, পার্শ্ব-শূল, শ্বাস, হিক্কা এবং বমি নষ্ট হইয়া থাকে।

মুস্তাদ্যষ্টাদশাঙ্গঃ।

মুস্ত-পর্ণ্যটকোশীর দেবদারু মহৌষধং।
ত্রিফলা ধন্বযাসঞ্চ নীলি কম্পিল্লকং ত্রিবৃৎ॥
কিরাত তিক্তকং পাঠা বলা কটুক রোহিণী।
মধুকং পিপ্পলী মূলং মুস্তাদ্যোগণ উচ্যতে॥
অষ্টাদশাঙ্গ মুদিত মেতদ্বা সন্নিপাতনুৎ।
পিত্তোত্তরে সন্নিপাতে হিতঞ্চোক্তং মনীষিভিঃ॥
মন্যাস্তম্ভে উরোঘাতে উরঃ পার্শ্ব-শিরোগ্রহে॥

১। মুথা, ২। ক্ষেৎপাপড়া, ৩। বেণার-মূল, ৪। দেবদারু, ৫। শুঁঠ, ৬। হরীতকী, ৭। বহেড়া, ৮। আমলা, ৯। নীল, ১০। কমলাগুড়ি, ১১। তেউড়ীমূল, ১২। চিরাতা, ১৩। আকনাদি, ১৪। বেড়েলা, ১৫। কট্‌কী, ১৬। যষ্টিমধু, ১৭। দুরালভা, ১৮। পিঁপুল মূল;—ইহার নাম মুস্তাদ্যগণ অথবা অষ্টা-দশাঙ্গ। এই আঠারো খানি দ্রব্যের কাথ পান করিলে, সন্নিপাত নষ্ট হয়। পিত্তোত্বন সন্নিপাতে ইহা হিতকর এবং মন্যাস্তম্ভ, উরু-ঘাত, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল শিরঃশূল প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী।

দ্রাক্ষাদ্যষ্টাদশাঙ্গঃ।

দ্রাক্ষা-তিক্তামৃতাশৃঙ্গী মুস্ত ভূনিম্ব-চন্দনং।
দুষ্পর্শোশীর ধন্যাক পদ্মকারিষ্ট পুষ্করং॥
ক্ষুদ্রাগুড়ী শটী পাঠা বালকৈঃ কথিতং জলং।
জীর্ণ জ্বরারুচি শ্বাস কাস শ্বয়থু নাশনং॥

১। দ্রাক্ষা, ২। কট্‌কী, ৩। গুলঞ্চ, ৪। কাঁকড়া শৃঙ্গী, ৫। মুথা, ৬। চিরাতা, ৭। রক্তচন্দন, ৮। দুরালভা, ৯। বেণার-মূল, ১০। ধনে, ১১। পদ্মকাষ্ঠ, ১২। নিম-ছাল, ১৩। কুড়, ১৪। কণ্টিকারী, ১৬। শুঁঠ, ১৬। শটী, ১৭। আকনাদি, ১৮। বালা;—এই ১৮ দ্রব্যের কাথ পান করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে।

অষ্টাদশাঙ্গ চূর্ণং।

বাসা লাক্ষাশ্বগন্ধাচ শটী শুণ্ঠী পুনর্ণবাঃ।
ত্বগেলা কেশরং কৃষ্ণা তালীশং চব্য কটফলং॥
বচা শৃঙ্গী শুভা পার্থং নিদিগ্ধিকা তথৈ বচ।
এতানি সম ভাগানি শ্লক্ষ্ম চূর্ণানি কারয়েৎ॥
তচ্চূর্ণং মধুনা লিহ্যান্নাসমেকং নিরন্তরং।
নিহন্তি রক্তপিত্তঞ্চ শ্বাস কাস ক্ষয়ং তথা।
ভাষিতং মূল দেবেনহষ্টাদশাঙ্গ সংজ্ঞিতং॥

১। বাসকমূল, ২। লাক্ষা, ৩। অশ্ব-গন্ধা, ৪। শটী, ৫। শুঁঠ, ৬। পুনর্ণবা, ৭। দারুচিনী, ৮। এলাচ, ৯। নাগেশ্বর, ১০। পিঁপুল, ১১। তালীশপত্র, ১২। চই, ১৩। কট্‌ফল, ১৪। বচ, ১৫। কাঁকড়াশৃঙ্গী,

১৬। বংশলোচন, ১৭। অর্জ্জুন ছাল, ১৮। কণ্টিকারী,—এই ১৮টী দ্রব্যের চূর্ণ মধুর সহিত ১ মাস লেহন করিলে, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস এবং ক্ষয় রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা দেখি না—প্রবন্ধ ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক—একটু কষ্ট করিলেই দেখিতে পাইবেন—আয়ুর্ব্বেদে এমন অনেক ঔষধ আছে, যাহা ১৮ খানি উপাদানে প্রস্তুত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি—আমবাত ও শীতপিত্তাদি রোগে—"অষ্টাদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু"; মহাকুষ্ঠে—"অষ্টাদশাঙ্গ লেপ" প্লীহা যকৃদধিকারে—"অষ্টাদশ পিপ্পলী" বাতব্যাধির "অষ্টাদশ শতিক প্রসারণী তৈল"—প্রভৃতি সিদ্ধযোগ গুলি—(১৮) আঠারোর মহিমাই ঘোষণা করিতেছে।

পূর্ব্বে প্রসবান্তে প্রসূতিকে সূতিকাগৃহে ঝাল খাওয়াইবার ব্যবস্থা ছিল। বাহিরে "তাপ" (স্বেদ দেওয়া) ভিতরে "ঝাল,"—এই "তাপ ঝাল" প্রসূতির শরীরে নূতন জীবনী শক্তি আনিয়া দিত। সে ঝালের মস্‌লা ছিল ১৮ খানি। যথা;—

১। মরিচ, ২। পিপুল, ৩। শুঁঠ, ৪। লবঙ্গ, ৫। জয়ত্রী, ৬। ছোট এলাচ, ৭। শটী, ৮। দারুচিনী, ৯। কৃষ্ণজীরা, ১০। যোয়ান, ১১। মেথী, ১২। বচ, ১৩। গিলা, ১৪। জায়ফল, ১৫। মৌরী, ১৬। চৈ, ১৭। রাধুনী, ১৮। তেজপত্র। এই "ঝাল মস্‌লা" চূর্ণ করিয়া, উষ্ণ ঘৃতের সহিত শিশু জননীকে খাওয়ান হইত। এখন এ বালাই উঠিয়া গিয়াছে। 'চা' 'ব্রাণ্ডী'—এখন "ঝালের" আসন গ্রহণ করিয়াছে। পাছে অগ্নি তাপে ও ধূম্রের কালিমায় বিলাসিনীর কাঞ্চন তনু বিবর্ণ হইয়া যায়,—তাই আতুর গৃহে "হরির লুটের" মোলিক মৌরসী স্থাপিত হইয়াছে!!

আগেকার গৃহিণীগণ—শিশুকে সুস্থ রাখিবার জন্য, মাঝে মাঝে "আলুই" খাওয়াইতেন। "আলুই"-প্রসাদে শিশুর সহসা রোগ হইত না। নব্যবঙ্গ কামিনী, আলুই প্রস্তুত ভুলিয়া গিয়াছেন। "আলুই" ১৮ খানি মস্‌লায় প্রস্তুত হইত। ১। কাচ্চ ১১। ২। নিসিন্দাপাতা, ৩। বেলপাতা, বাসক, যোয়ান, ৫। রাঁধুনী, ৬। বড়এলাচ ১৭। বহেড়ার শাঁস, ৮। তুলসী মঞ্জরী, ৯। সরষে বীজ, ১০। আদা, ১১। নাগদোনা, ১২। পানের বোঁটা, ১৩। জায়ফল, ১৪। মৌরাঙ্গি ১৫। মরিচ, ১৬। আকরকোরা, ১৭। আস্কৌ-কেশী, ১৮। বেলশুঁঠ।

দন্তোদ্ভব কালে শিশুদের অনেক রোগ হইয়া থাকে—উদরাময়, আক্ষেপ (রস তড়কা) ইত্যাদি। এই সকল বিঘ্ন নিবারণের জন্য সেকালের গৃহিণীগণ শিশুর কটিদেশে ১৮টী নিম্ববৃক্ষের ফল—সূত্রে গাঁথিয়া পরাইয়া দিতেন। এ প্রথা এক্ষণে রূপান্তরিত হইয়াছে;—এখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশের জন্য—শিশুর কটিদেশে সোণার নিমফল পরান হইয়া থাকে।

যখন কেশ তৈলের এত ছড়াছড়ি ছিল না, তখন নারীগণ—"মাথাঘষা"র সুরভি দিয়া কেশ সংস্কার করিতেন। ঐ মাথা ঘষার মস্‌লাও ছিল ১৮ খানি। ১। একাঙ্গী ২। শ্বেতচন্দন, ৩। অগুরু, ৪। কালীয়ক, ৫। জটামাংসী, ৬। মুরামাংসী, ৭। কাকুলা ৮। শৈলজ, ৯। দনা, ১০। তাম্বুল, ১১।

মেথী, ১২। আমলা, ১৩। লতাকস্তুরী, ১৪। ঘোড়বচ, ১৫। গোলাপফুল, ১৬। রেণুক, ১৭। বেণারমূল, ১৮। নাগেশ্বর।

বিষ কন্যার বয়স যখন ১৮ বৎসর হয়, তখন তাহার দেহে—পূর্ণ বিষ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে।

মানুষের বিপদ ১৮ প্রকার ;—১। ঋণ, ২। রোগ, ৩। দুর্ভিক্ষ, ৪। অনাবৃষ্টি, ৫। ৬। বিবাদ, ৭। চৌর্য্য, ৮। কুগ্রহ, ক্রোপ, ১০। জাতি-নাশ, ১১। শোক ত্তি-হানি, ১৩। অকীর্ত্তি, ১৪। কুলক্ষয়, হৃদাহ, ১৬। অভিচার, ১৭। প্রবাস, রাজ-রোষ।

আসব বিধান মতে—সন্ধান ১৮ প্রকার। কোহল, ২। অরিষ্ট, ৩। আসব, ৪। সুরা ৫। প্রসন্না, ৬। শীধু, ৭। কাকোলী, ৮। বারুণী, ৯। মৈরেয়, ১০। সৌবীর, ১১। কাঞ্জিক, ১২। শুক্ত, ১৩। চুক্র, ১৪। শিখরিণী, ১৫। মধুলিকা, ১৬। বক্কলী, ১৭। গৌড়ী, ১৮। শীতরস।

নির্ঘণ্ট মতে—দ্রব্যের শ্রেণী ১৮ প্রকার, ১। দীপন, ২। পাচন, ৩। শমন, ৪। অনুলোমন, ৫। স্রংসন, ৬। ভেদন, ৭। রেচন, ৮। বমন, ৯। শোধন, ১০। ছেদন, ১১। লেখন, ১২। সংগ্রাহী, ১৩। স্তম্ভন, ১৪। রসায়ন, ১৫। বাজীকর, ১৬। প্রবর্ত্তক, ১৭ ক্ষয়কর, ১৮। মদকর।

কশ্যপের মতে বিষনাশক অগদ ১৮টী। ১। পুনর্ণবা, ২। ক্যালাকড়া, ৩। কাঁটা শিরীষ, ৪। গৃহধূম, ৫। দারুহরিদ্রা, ৬। সিদ্ধার্থ, ৭। তাম্র, ৮। তগর পাদুকা, ৯। বন্ধ্যা কর্কোট; ১০। মূত্র, ১১। অর্কমূল, ১২। তুলসী, ১৩। গোরোচনা, ১৪। মদন ফল, ১৫। হিং, ১৬। আকনাদি, ১৭। আতইচ, ১৮। জলৌকা।

রাবণোক্ত শিব নির্ম্মাল্য ধূপের উপাদান ১৮ খানি। ১। সর্জ্জরস, ২। শিলারস, ৩। দেবদারু, ৪। রক্তচন্দন, ৫। শ্বেতচন্দন, ৬ গাঁঠিয়ালা, ৭। নিম্বপত্র, ৮। কর্পূর, ৯। জয়ত্রী, ১০। কুঙ্কুম, ১১। শিখীপুচ্ছ, ১২। রুদ্রাক্ষ, ১৩। সরল, ১৪। জটামাংসী, ১৫। পদ্মকাষ্ঠ, ১৬। গুগ্‌গুলু, ১৭। সর্ষপ, ১৮। ঘৃত। এই ধূপে গ্রহ ও অলক্ষ্মী নিবারিত হইয়া থাকে।

অপমৃত্যুর প্রতিকার ১৮ প্রকার :—১। নস্য, ২। বমন, ৩। পার্শ্ব পীড়ন, ৪। দাহ, ৫। বন্ধন, ৬। ছেদন, ৭। আকর্ষণ, ৮। সন্তাড়ন, ৯। স্বেদ, ১০। মর্দ্দন, ১১। প্রলেপ, ১২। শোষণ, ১৩। বিরেচন, ১৪। ফুৎকার, ১৫। ঘর্ষণ, ১৬। সমবল, ১৭। শ্বাস প্রবর্ত্তন, ১৮। মন্ত্র।

বিষ-বৈদ্যদের মতে—সর্প দংশনের চিকিৎসাও ১৮ প্রকার। ১। উদ্বর্ত্তন, ২। আচুষণ, ৩। দহন, ৪। ছেদন, ৫। বন্ধন, ৬। মন্ত্র, ৭। রজ্জু, ৮। শিরাবেধ, ৯। রক্তমোক্ষণ, ১০। লেখন, ১১। অগদ, ১২। বমন, ১৩। অঞ্জন, ১৪। সেচন, ১৫। বিরেচন, ১৬। প্রধমন, ১৭। দুন্দুভি বাদ্য, ১৮। নির্হরণ।

চৈত্য বৃক্ষ (দেবাধিষ্ঠিত বৃক্ষ) ১৮টী। ১। বট, ২। অশ্বত্থ, ৩। প্লক্ষ, ৪। নিম্ব, ৫। বিল্ব, ৬। উড়ুম্বর, ৭। শিংশপা, ৮। ধব, ৯। তুলসী, ১০। শমী, ১১। শাল্মলী, ১২। তাল, ১৩। নারিকেল, ১৪। দেবদারু, ১৫। কাঞ্চনার, ১৬। শ্যাযোট, ১৭। বিভীতক, ১৮। ভিন্তিড়ী।

গর্ভপাতের কারণ ১৮টী। ১। ব্যায়াম, ২। উপবাস, ৩। মৈথুন, ৪। যানারোহণ, ৫। রক্ত মোক্ষণ, ৬। উচ্চভাষ, ৭। উৎকটাসন, ৮। পতন, ৯। কঠিন শয্যা, ১০। উদ্বর্ত্তন, ১১। রাত্রি জাগরণ, ১২। শোক, ১৩। বেগধারণ, ১৪। ক্রোধ, ১৫। ভয়, ১৬। নির্জ্জনবাস, ১৭। দ্রুত ধাবন, ১৮। ভারোত্তোলন।

সুস্থ ব্যক্তির নিশ্বাস—মিনিটে ১৮ বার।

১৮ দিন, ১৮ মাস, ১৮ বছর, অতীত না হইলে নাকি শৃগাল কুক্কুর দষ্ট ব্যক্তির "জলাতঙ্কের" ফাঁড়া কাটে না।

স্বর্গ বেশ্যার সংখ্যা ১৮টী। রম্ভা, মিশ্রকেশী ইত্যাদি।

সম্পদের চিহ্ন ১৮টী। হয়, হস্তী, প্রভৃতি।

মালদহের কন্ধাই জাতি—পূর্ব্বে ১৮ প্রকার তুলার চাষ করিত।

বৈষ্ণব যুগে ১৮ জন পদকর্ত্তা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতের উপাসক সম্প্রদায় ১৮ ভাগে বিভক্ত।

রতি-বন্ধ ১৮ প্রকার।

নীত্যনুশাসন ১৮টী। চিত্তবিকার ১৮ প্রকার। বাদ্য যন্ত্র ১৮ প্রকার। বাদ্য যন্ত্রের তালও ১৮ প্রকার,—১। চৌতাল, ২। রুদ্রতাল, ৩। পটতাল, ৪। ব্রহ্মতাল, ৫। ধর্ম্মতাল (ধামার) ৭। ঝম্পতাল (ঝাপতাল) ৮। ত্রিতালী (কাওয়ালী, তেতালা) ৯। যতি (যৎ) ১০। দেবতাল (ফোরদস্ত) ১১। তিওট্ট, ১২। রূপক, ১৩। সুরফাঁক্তা, ১৪। একতালা, ১৫। কাহারবা, ১৬। দাদরা, ১৭। দশকোশী, ১৮। তেওরা।

শিল্প শাস্ত্রের মতে—বস্ত্র ১৮ প্রকার। ১। ক্ষৌম, ২। শাণ, ৩। কার্পাস, ৪। উর্ণ, ৫। অংশুপট্ট, ৬। কৌশেয়, ৭। কুতপ, ৮। কম্বল, ৯। সুসূক্ষ্ম, ১০। কুশাগ্রীয়, ১১। চীনাংশুক, ১২। পুষ্পরক্ত, ১৩। আবিক, ১৪। বাদর, ১৫। রাঙ্কব, ১৬। দুগুল, ১৭। আতসী, ১৮। পার্ব্বতী।

প্রাচীন মতে—প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যাও ১৮। ১। মহাব্যূহপতি, ২। মহাসন্ধি বিগ্রহিক, ৩। মহাসর্ব্বাধিকৃত, ৪। মহাপ্রতীহার, ৫। কোট্টপাল (দুর্গরক্ষক) ৬। দৌঃসাধসাধনিক (গ্রাম পরিদর্শক) ৭। চৌরোদ্ধরণিক (পুলিশ কর্ম্মচারী বিশেষ) ৮। নৌবলব্যাপৃতক, ১০। হস্তি ব্যাপৃতক, ১১। অশ্বাধ্যক্ষ, ১২। গবাধ্যক্ষ, ১৩। গৌল্মিক, ১৪। শৌল্কিক (শুল্ক সংগ্রহকারী) ১৫। দাণ্ডপাশিক, ১৬। মহাক্ষপাটলিক, ১৭। বিষয়পতি, ১৮। মহামাণ্ডলিক।

বৈদিক যুগে—স্রোচনী (নথ) সুবর্ণ খাদী (খাড়) প্রবর্ত্ত (কুণ্ডল) প্রভৃতি অষ্টাদশ বিধ অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত।

পল্লী-প্রসঙ্গ।

এবার কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মফঃস্বলের স্থানে স্থানেও ইহার প্রকোপ কম নহে। মেদিনীপুরের সহযোগী "নীহারে" প্রকাশ,—

বসন্তের প্রকোপ—কাঁথি সহরের উপর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী দারুয়া, খাগড়াবনী ও ভগবানপুর প্রভৃতি গ্রামে সম্প্রতি বসন্তের ভীষণ প্রকোপ চলিয়াছে। বহুলোকে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছে এবং অনেকেও মারা যাইতেছে। ইতিমধ্যে ঐ সকল স্থানে অনেকগুলি লোক বসন্তে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে এবং এখনও উহাতে লোকে মারা যাইতেছে। বসন্ত এরূপ মারাত্মকভাবে সংক্রামিত হওয়ায় পল্লীবাসীদের একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

এই রোগের সংক্রামকতার সময় যে টীকা লওয়ার প্রয়োজন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ইহার জন্য যে সুব্যবস্থা করিয়াছেন মফঃস্বলে সেরূপ নাই। মেদিনীপুরের "নীহার" বসন্তের প্রকোপের সংবাদ দানের পরই লিখিতেছেন,—

সকলে টীকা লইবার জন্য এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়াছে যে, কমিটীর নিযুক্ত টীকাদার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও সকলকে টীকা দিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কমিটী একজন টীকাদার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকেই গ্রামে গ্রামে গিয়া টীকা দিতে হইতেছে। এইরূপ ব্যবস্থায় এখন এখানে বহুলোকেরই টীকা হইয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই যাহাতে এখন বিনামূল্যে সকলকে টীকা দিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য আমরা আমাদের জেলা-বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

"নীহারে"র লেখায় বুঝা গেল, সেখানে যাহোক একজনও টীকাদার নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে, তবে লোক সংখ্যার তুলনায় মাত্র একজন টীকাদার যথেষ্ট নহে। কিন্তু ২৪শ পরগণার স্থানে স্থানে টীকাদার নিয়োগের কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নাই জানিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। "ডায়মণ্ড হারবার হিতৈষী"তে প্রকাশ,—

টীকাদার চাই।—ডায়মণ্ডহারবার মগরাহাট থানার সেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। * * * কিন্তু টীকাদারের সঙ্গে কয়েক বৎসর যাবৎ দেখা সাক্ষাৎ নাই।

ঐ সংখ্যার "ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষীতে" আরও প্রকাশ,—

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত কুল্পী থানার অন্তর্ব্বর্ত্তী শ্যামবহুর চক্ গ্রামের কোন কোন বাটীতে সম্প্রতি বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এখানে টীকা দিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। আশা করি, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগকে বাধিত করিবেন।

অবিলম্বে সেনেটারি বিভাগ হইতে ইহার ব্যবস্থা করা হউক,—ইহার জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি।

বসন্তের প্রাদুর্ভাবে তো বঙ্গের অনেক স্থানই বিপর্য্যস্ত, ইহার উপরে বাঙ্গালার কোনো কোনো পল্লী হইতে আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জার সংবাদও পাইতেছি। সহযোগী "ঢাকা প্রকাশ" চট্টগ্রামের সংবাদে জানাইতেছেন—

কুমিল্লায় ইনফ্লুয়েঞ্জা—কুমিল্লা সহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা

রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। গত এক সপ্তাহে এই রোগে ৮ জন লোক মারা গিয়াছে। কোন কোন বাসায় সমস্ত লোকই এই ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইয়াছেন।

জলকষ্টই যে পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতির অন্তরায় সে বিষয়ে মতভেদ নাই। আধিব্যাধির লীলানিকেতন বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে পল্লীর জলকষ্ট দূর করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হইতে হইবে। মফঃস্বলের জেলা বোর্ডগুলি অবশ্য এ জন্য প্রতিবৎসরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নহে। সহযোগী "হিতবাদীতে" ঢাকার পিরুজালি হইতে একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন,—

ঢাকা—পিরুজালি। পিরুজালি গ্রামটীতে অনেক লোকের বাস, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রামে জলকষ্ট অত্যন্ত অধিক। লোকালবোর্ড কতকগুলি ইন্দারা খনন করাইয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে গ্রামবাসীর জলাভাব দূর হয় নাই। গ্রামের ৪।৫ মাইল দক্ষিণে একটী নদী আছে, সে নদী হইতে জল আনিয়া ব্যবহার করা গৃহস্থগণেরপক্ষে অসম্ভব। গ্রামে প্রায় প্রত্যেক বাটীতেই কূপ আছে, বর্ষাকালে সেই কূপ জলে পরিপূর্ণ হয় বটে, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে অধিকাংশ কূপই জলশূন্য হয়। ইন্দারাগুলিও অনেক দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে অন্ততঃ আর চার পাঁচটী ইন্দারা না হইলে জলকষ্ট দূর হইবার সম্ভবনা নাই।

আবার বর্দ্ধমান পূর্ব্বস্থলী—নপাড়া হইতে একজন সংবাদ দাতা ঐ হিতবাদীতেই জলকষ্টের ফলে সেখানকার দুর্দ্দশার পরিচয় দিয়াছেন দেখুন,—

কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জায় এই সমস্ত স্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল ও চিকিৎসকের অভাব এ অঞ্চলকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। দূষিত জল জল ব্যবহার করিয়া লোক রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর তিন ক্রোশের মধ্যে ডাক্তার নাই, বিনা চিকিৎসায় ভুগিয়া ভুগিয়া হতভাগ্যগণ মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। শ্রমজীবী ও কৃষক সম্প্রদায়ই এ অঞ্চলে অধিক। ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অল্প ব্যয়ে চিকিৎসার উপায় বিধান এবং জলাভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সংবাদ দাতা ঐ সকল কথা বলিয়া এ বিষয়ের প্রতীকার কল্পে গভর্ণমেণ্টের করুণা-ভিক্ষা করিয়াছেন। আমরাও সংবাদ দাতার প্রতিধ্বনি করিতেছি।

শুধু বসন্ত ও ইনফ্লুয়েঞ্জা নহে, মফঃস্বলের স্থানে স্থানে কলেরাও আরম্ভ হইয়াছে। "বীরভূমবাসীতে" প্রকাশ,—

নানুর থানার সংবাদ—পাবুরীগ্রামে ভয়ানক কলেরা হইতেছে। ইতিমধ্যে ১০।১২ জন মরিয়াছে।

বাঙ্গালার চিরব্যাপী জ্বর রোগও ইহারই মধ্যে স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছে। মেদিনীপুরের "নীহার" এ সংবাদ আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিতেছেন,—

বসন্তের আক্রমণে অনেকেই মারা গিয়াছে। আপাততঃ উহার আক্রমণ কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। জ্বরে ও পেটের পীড়ায় অনেকেই আক্রান্ত হইতেছে।

আধিব্যাধির লীলা নিকেতন বঙ্গদেশে দাতব্য ঔষধালয়ের সংখ্যা যত বর্দ্ধিত হয় ততই মঙ্গলের কথা। রাজসাহীর "হিন্দুরঞ্জিকা" সংবাদ দিতেছেন,—

মোহনপুর থানায় একটি সরকারী ডাক্তারখানা স্থাপন করিবার জন্য আয়োজন হইতেছে। স্থানীয় সাহায্যে যদি ৫০০৲ পাঁচশত টাকা সংগ্রহ হয় তবে রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড তথায় ডাক্তারখানা স্থাপন করিতে পারেন।

শুধু তাহাই নহে, রাজসাহী জেলায় পীড়ার প্রকোপ—বাহুল্য যেরূপ, সে পরিমাণ

চিকিৎসক নাই। এই অভাব দূরীকরণের জন্য রাজসাহীর ছাত্রবৃন্দ যাহাতে চিকিৎসা শিক্ষার সুবিধা পাইতে পারে, তাহার জন্য কেহ কেহ উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা আরও সুখী হইয়াছি। 'হিন্দুরঞ্জিকা'ই আমাদিগকে সে শুভ সংবাদ জানাইয়াছেন,—

"রাজসাহী টাউনে দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় স্থাপনের চেষ্টা"—

অনারেবল শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী এম, এ, বিল, মহোদয় রাজসাহী টাউনে একটি "দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়" স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। রাজসাহী আয়ুর্ব্বেদ সভা তাহার একটি এষ্টিমেট করিয়াছেন যে উক্ত ঔষধালয়টি স্থাপন করিতে আপাততঃ এককালীন ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা নগদ ও মাসিক ২০০৲ দুই শত টাকা খরচ দরকার। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে পুঠিয়ার পাঁচ আনীর রাণী হেমন্তকুমারী দেবী ও কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুর এ বিষয়ে আর্থিক সাহায্য করিতে স্বীকৃত আছেন ও টাউনের মাড়োয়ারী মহাজন জ্ঞানীরাম বাবু এককালীন ১০০০৲ এক হাজার টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

বসন্ত, ওলাউঠা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা তিনটি ব্যাধিই বাঙ্গালা দেশকে যেরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ফল যে কি হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়। ২১শে চৈত্রের ঢাকা প্রকাশ সংবাদ দিতেছেন,—

সহরের স্বাস্থ্য—

সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে। বিগত দুই-সপ্তাহ যাবত এসহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা দিয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়ার আক্রমণও বেশ আছে। সহরতলী ফরিদাবাদ অঞ্চলে ওলাউঠাও প্রকট হইয়াছে।

বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য ও শস্য সংবাদ—

সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ যে, বিক্রমপুরের অনেক স্থানে ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ আছে। লোহজঙ্গ অঞ্চলে বসন্ত দেখা দিয়াছে। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী কুশারী-পাড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে বসন্তের প্রকোপ একটু হ্রাস পাইয়াছে।

শিশু মৃত্যু নিবারণের জন্য কলিকাতায় স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে ইহার ফল যে শুভ হইবে তাহা আশা করা যায়। মফঃস্বলেও এইরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত। নদীয়ার "বঙ্গরত্নে" প্রকাশ,—

সম্প্রতি নদীয়ার সিবিল সার্জ্জন মহোদয়ের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগরে স্থানীয় শিশুদের অকাল মৃত্যু নিবারণ কল্পে এখানে একটী সমিতি গঠিত করিয়াছেন। আগামী এপ্রিল মাস হইতে এই সমিতির কার্য্য করিবার জন্য এক জন শিক্ষিতা ধাত্রী স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে। এই ধাত্রী প্রত্যেক গরীব লোকের বাটীতে বিনা পারিশ্রমিকে প্রসব কালে সাহায্য করিবেন এবং শিশু রক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিবেন। কেবল মাত্র তাঁহার গাড়ী ভাড়া দিলেই হইবে। অতি গরীব হইলে ঐ গাড়ীভাড়া পর্য্যন্ত সমিতি বহন করিবেন। গরীব ভিন্ন অন্যলোকের জন্য এই সমিতিতে নূন্য কল্পে ৫৲ টাকা জমা দিলেই ঐ ধাত্রী সন্তান প্রসব হইতে ছয় দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার করিয়া প্রসূত ও প্রসূতিকে দেখিয়া আসিবেন। গাড়ীভাড়া আলাহিদা দিতে হইবে।

দুঃস্থ এবং নিঃসহায় গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের যতদূর সম্ভব প্রসবের সময় এবং ছয় দিন পর্য্যন্ত পথ্যাদি দিয়া সাহায্য করিবেন।

IMPERIAL

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—জ্যৈষ্ঠ। | ৯ম সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস।

—:•:—

জতূকাস্থি। *

জতূকাস্থি • (২৭শ চিত্র)—জতূকাস্থি শিরঃসম্পুটের মধ্যভূমি নির্ম্মাণকারক, জতূকার (চামচিকের) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং সমস্ত শিরঃকপালের কেন্দ্রবন্ধন স্বরূপ। ইহার চারিটী অংশ যথা,—মধ্যে জতূকাশরীর উভয় পার্শ্বে বৃহৎ পক্ষতিদ্বয় ও নিম্নে ক্ষুদ্র পক্ষতিদ্বয় এবং সর্ব্বনিম্নে চরণদ্বয়। তন্মধ্যে—

(১) 'জতূকাশরীর' নামক মধ্যস্থ পিণ্ড উচ্চাবচ এবং শূন্যগর্ভ। ইহার গর্ভস্থিত কোটরগুলি 'জতূকাকোটর' নামে অভিহিত এবং ঋর্ঝরাস্থির কোটর সকলের সহিত সম্মিলিত।

জতূকা শরীরের চারিটী তল, যথা—সম্মুখ তল, পশ্চাৎ তল, ঊর্দ্ধ তল এবং অধস্তল। তন্মধ্যে—

(ক) সম্মুখ তল ঋর্ঝরাস্থির উভয়দিকের পার্শ্বপিণ্ডের সহিত সন্ধিযুক্ত এবং উহার মধ্য দেশের সমুন্নত রেখা ঋর্ঝরাস্থির মধ্যফলকের সহিত সংহিত। সম্মুখের ঊর্দ্ধভাগে 'ত্রিকোণকণ্টক' নামক একটী চূড়াকার প্রবর্দ্ধন আছে, উহা ঋর্ঝরাস্থির ছাদের ন্যায় ফলকের সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

(খ) পশ্চাৎ তল চতুষ্কোণ এবং পশ্চাৎকপালের মূলভাগের সহিত সন্ধিযুক্ত।

(গ) ঊর্দ্ধতলে ত্রিকোণকণ্টকের পশ্চাতে 'দৃষ্টিনাড়ীপরিখা' নামে একটী পরিখা আছে এবং উক্ত পরিখার দুইপ্রান্তে 'দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্র' নামে দুইটী ছিদ্র আছে। এই পরিখা দৃষ্টিনাড়ী ধারণের জন্য এবং রন্ধ্র

* ইং—Sphenoid Bone—স্ফিনয়েড বোন্।

দুইটী দৃষ্টিনাড়ীদ্বয়ের অক্ষিকূটে প্রবেশের জন্য। ইহাদের পশ্চাতে 'পোষণিকা' নামক গ্রন্থি ধারণের জন্য 'পোষণিকা খাত' নামে একটী খাত আছে। উক্ত খাতের পশ্চাতে 'সুষম্নাপীঠ' নামে যে উন্নত কূট আছে, উহা সুষম্নাশীর্ষ ধারণ করিয়া থাকে। এই কূটের উভয় পার্শ্বে মাতৃকা ধমনীদ্বয় ধারণের জন্য 'মাতৃকা পরিখা' নামে দুইটী গভীর খাত আছে। ইহার সম্মুখভাগে এক এক দিকে পরে পরে তিনটী গুলিকা অবস্থিত।

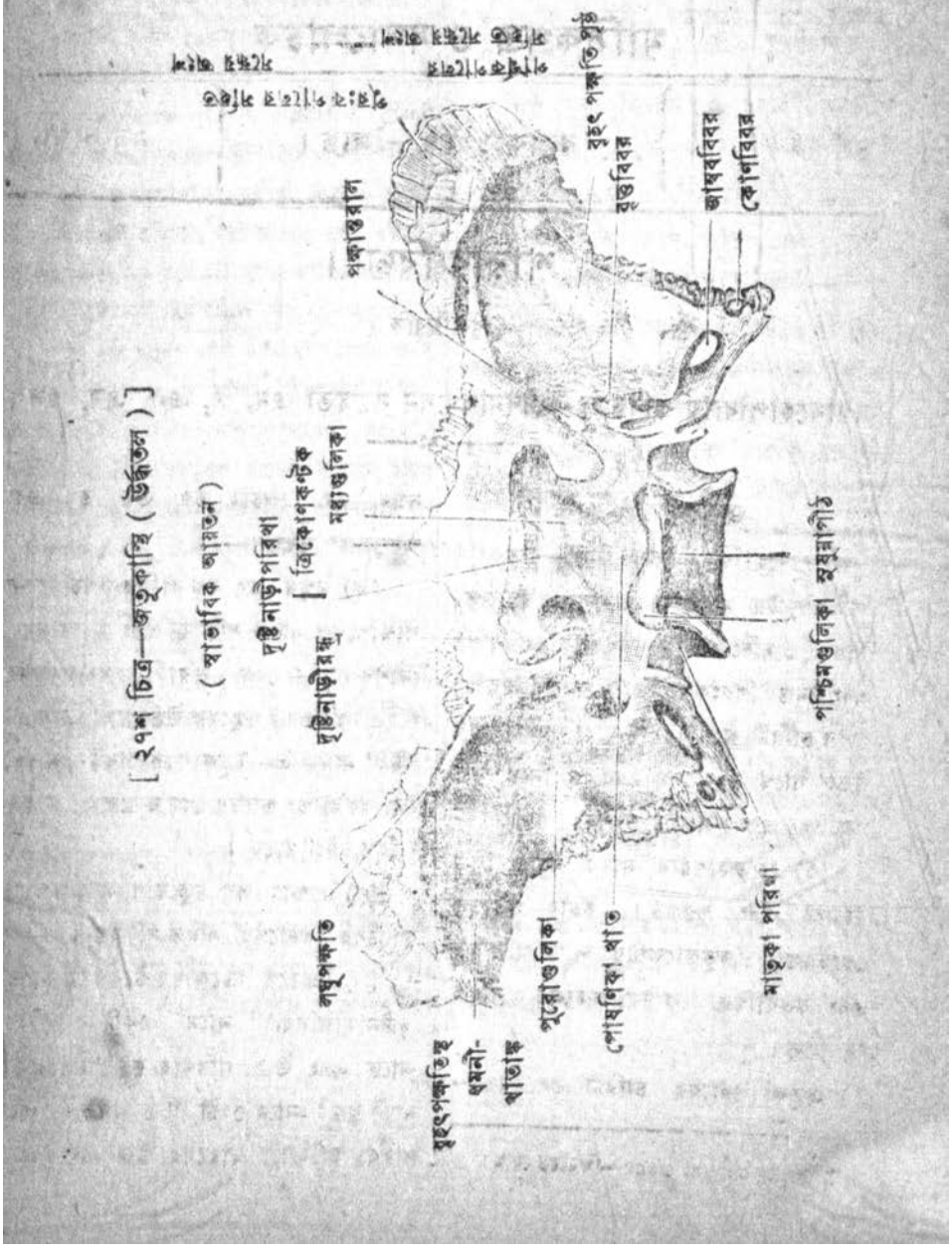

[২৭শ চিত্র—জতূকাস্থি (ঊর্দ্ধতল)]

(স্বাভাবিক আয়তন)

(ঘ) জতুকাশরীরের অধস্তল নাসাগুহা ও কণ্ঠবিবরের আচ্ছাদন ভূত। ইহাতে যে স্থূলমূল ও উন্নতাগ্র রেখা আছে, উহা 'রসনিকা' নামে অভিহিত। এই রেখা নাসিকার মধ্যপ্রাচীরভূত সীরিকাস্থির পশ্চিম প্রান্তের খাঁজের সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

(২) বৃহৎ পক্ষতিদ্বয় জতুকাস্থির উভয় দিকে শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রায় ত্রিকোণাকার। এক এক পক্ষের তিনটী তল, যথা—উর্দ্ধতল, সম্মুখতল এবং বহিস্তল। তন্মধ্যে—

(ক) উর্দ্ধতলের নাম 'পক্ষতিপৃষ্ঠ'। ইহা মস্তিষ্কের মধ্যভূমিভূত এবং উহাতে 'বৃত্তবিবর' ও 'জাম্ববিবর' নামে দুইটী বিবর আছে। এই দুইটী বিবরের ভিতর দিয়া পঞ্চম নাড়ীর মধ্যম ও পশ্চিম শাখা যথাক্রমে নির্গত হইয়া থাকে। ইহার মূলে কোণ বিবর' নামে যে ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া 'কলাপোষণী' ধমনী প্রবেশ করিয়া থাকে।

(খ) সম্মুখতল চতুষ্কোণ এবং নেত্রকূটের বহিঃপ্রাচীর স্বরূপ।

(গ) বহিস্তল বিশেষ উচ্চাবচ এবং 'শঙ্খাধরিকা' রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। রেখার উর্দ্ধভাগ শঙ্খদেশ নির্ম্মাণকারক ও শঙ্খচ্ছদা পেশীর প্রভবস্থল; অধোভাগ গণ্ডমূলের খাতে সংস্থিত।

(৩) লঘুপক্ষতিদ্বয় জতুকাশরীরের সম্মুখে উভয় দিকে অবস্থিত এবং পুরঃকপালাস্থির 'নেত্রচ্ছদিফলক'দ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে উভয়ের সংযোজক 'ত্রিকোণকণ্টক' এবং তন্মূলস্থ দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্রদ্বয়ের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

লঘু ও বৃহৎ পক্ষতিদ্বয়ের মধ্যে এক এক দিকে যে ত্রিকোণপ্রায় অন্তরাল আছে, উহারা 'পক্ষান্তরাল' নামে আখ্যাত। এই দুইটী অন্তরালের ভিতর দিয়া তৃতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠী নাড়ী, পঞ্চমী নাড়ীর নেত্রগামিনী প্রথমা শাখা এবং নেত্রগামিনী শিরা ও ধমনী নির্গত হইয়া থাকে।

(৪) চরণদ্বয় জতুকাস্থি শরীরের পশ্চাৎ প্রান্তের উভয় দিক হইতে নিম্ন দিকে বিস্তৃত। এক এক চরণে দুইটী করিয়া অস্থিফলক আছে। তন্মধ্যে সম্মুখস্থ ফলক আয়তপৃষ্ঠ এবং পশ্চাতের ফলক অঙ্কুশাগ্র। এই অঙ্কুশকে আশ্রয় করিয়া 'তালুতংসনী পেশী বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উভয় চরণের মধ্যে যে সুব্যক্ত অন্তরাল আছে, তথায় তাম্বস্থি সংহিত হইয়া থাকে।

সন্ধি—জতুকাস্থি আটখানি শিরঃসম্পুট নির্ম্মাপক অস্থির সহিত এবং গণ্ডাস্থিদ্বয়, তাম্বস্থিদ্বয় ও সীরিকা—এই পাঁচখানি মুখমণ্ডলের অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। সন্ধান প্রকার চিত্রে দ্রষ্টব্য।

পেশী—জতুকাস্থিতে এক এক দিকে এগারটী করিয়া পেশী সংযুক্ত থাকে। যথা—বৃহৎ পক্ষতির বহিস্তলে দুইটী, লঘুপক্ষতির সম্মুখভাগে অক্ষিকূটগ ছয়টি, এবং চরণ ফলকে তিনটী পেশীর সংযোগ আছে।

[২৮শ চিত্র—ঝর্ঝরাস্থি]

(পশ্চাৎ হইতে দৃষ্ট - স্বাভাবিক আয়তন)

ঝর্ঝরাস্থি*—ঝর্ঝরাস্থি নামক নাসামূলগত পিণ্ডাকার অস্থি ছিদ্রবহুল এবং অক্ষিকোটরদ্বয়ের অন্তরালে গূঢ়ভাবে অবস্থিত। ইহার তিনটী অংশ যথা,—মধ্যফলক, চালনীপটল এবং পার্শ্বপিণ্ডদ্বয়। তন্মধ্যে—

(১) মধ্যফলক—নাসামূলের মধ্য প্রাচীর নির্ম্মাণের সহায়ভূত পাতলা ফলকের ন্যায়। ইহার অগ্রধারায় পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক এবং নাসাস্থিদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ দ্বারা সংহিত হইয়া থাকে। পশ্চাৎ ধারায় জতুকাস্থির পুরস্তলস্থিত রসনিকাখ্য মধ্যরেখা এবং নামক সীরিকা অস্থি সংহিত হয়। অধোধারা নাসাগ্রভাগের মধ্য প্রাচীরভূত ত্রিকোণাখ্য তরুণাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

(২) চালনীপটল—নাসামূলের ছাদস্বরূপ, চালনীর ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্রবহুল এবং মধ্যফলকের মস্তকে সংলগ্ন। ইহার চূড়ায় 'শিখরকণ্টক' নামে যে প্রবর্দ্ধন আছে তাহাতে 'দাত্রিকা' কলাভাগ সংযুক্ত থাকে এবং ইহাতে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ আছে তাহার ভিতর দিয়া গন্ধগ্রাহিণী নাড়ীর প্রতানসমূহ নাসামধ্যে বিস্তৃত হয়।

(৩) পার্শ্বপিণ্ডদ্বয় মধুচক্রের ন্যায় ছিদ্রগর্ভ এবং খুব পাতলা পত্রবৎ অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। প্রত্যেক পার্শ্বপিণ্ডের ছয়টী তল। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ তল কোটরবহুল এবং পুরঃকপালের মহাপরিখার পরিধির সহিত সংহিত। পুরস্তল অশ্রুপীঠদ্বয় ও ঊর্দ্ধ হনুস্থিদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত এবং উহার অধঃস্থিত কোটরগুলি নাসাগুহার সহিত সংমিলিত। পশ্চাৎ তলও ছিদ্রবহুল এবং জতুকাস্থির কোটরযুক্ত পুরস্তলের সহিত সন্ধিযুক্ত। অন্তস্তল নাসাগুহার পার্শ্বপ্রাচীর স্বরূপ এবং দুইখানি ক্ষুদ্র শুক্তিকাকার অস্থিফলক বিশিষ্ট। উক্ত শুক্তিকাকার অস্থি দুইখানি

* ইং—Ethmoid Bone—এথময়েড বোন্।

যথাক্রমে ঊর্দ্ধশুক্তিকা এবং মধ্যশুক্তিকা নামে অভিহিত। ঊর্দ্ধ শুক্তিকা নাসাগুহার ঊর্দ্ধ সুড়ঙ্গের * এবং মধ্য শুক্তিকা মধ্যসুড়ঙ্গের চূড়ার স্বরূপ। মধ্যশুক্তিকার কিঞ্চিৎ নিম্নে অধঃশুক্তিকাস্থির সন্ধিস্থান। বহিস্তল সুচিকণ চতুষ্কোণ ফলকনির্ম্মিত এবং নেত্রকোটরের অন্তঃপীঠনির্ম্মাপক বলিয়া 'নেত্রান্তঃপীঠ' নামে অভিহিত।

সন্ধি—ঝর্ঝরাস্থি মস্তকের তেরখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা—পুরঃকপাল, ভতুকাস্থি, সীরিকা এই তিনখানি একক অস্থির সহিত এবং নাসাস্থি, ঊর্দ্ধহনুস্থি, তালুস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি ও শুক্তিকাস্থি—এই পাঁচটী যুগ্ম অস্থির সহিত।

এই অস্থির সহিত কোন পেশীর সংযোগ নাই।

কপাল চক্রক। † মস্তকের কপালাস্থি সমূহের সীমন্তে দন্তুর ধারার মধ্যে কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার অস্থি সমূহ দেখা যায়। ঐরূপ অস্থি প্রায়ই পার্শ্ব কপাল দ্বয়ের সন্ধিস্থলে—বিশেষতঃ ব্রহ্মরন্ধ্র এবং শিররক্ষ্রের নিকটে দেখা যায়। উহাদের অস্তিত্বের কোন নিশ্চয় নাই বলিয়া পৃথক্ ভাবে গণনা করা হয় না।

মুখমণ্ডলের অস্থি।

মুখমণ্ডল চতুর্দ্দশ খানি অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত, যথা—দুই খানি নাসাস্থি, দুই খানি ঊর্দ্ধহনুস্থি, দুই খানি অশ্রুপীঠাস্থি, দুইখানি গণ্ডাস্থি, দুইখানি তালুস্থি, দুইখানি শুক্তিকাস্থি; একখানি সীরিকাস্থি, এবং এক খানি অধোহনুস্থি। তন্মধ্যে হনুস্থিত্রয় ভক্ষণ চর্ব্বণাদি কার্য্য সাধন করে এবং অন্যান্য অস্থি গুলি চক্ষু নাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান নির্ম্মাণ ও অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকে।

নাসাস্থি*—নাসাস্থি দুইখানি নাসামূলে অবস্থিত বহিঃপৃষ্ঠে ন্যুব্জ এবং অন্তর্ভাগে কোরোদর। ইহারা মধ্যরেখায় পরস্পর সংহিত। নাসাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধপ্রান্ত পুরঃকপালাস্থির নাসামূলখাতের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব ঊর্দ্ধহনুস্থির নাসাকূটের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহাদের অধঃপ্রান্ত নাসাপার্শ্বিক নামক তরুণাস্থিদ্বয়ের সহিত সংহিত। পশ্চাৎভাগে পরস্পরের সন্ধান রেখায় পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক এবং ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলক সংহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নাসাস্থির বহিস্তলের মধ্যে সিরা প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে এবং অভ্যন্তর ভাগে নাসানাড়ী ধারণের জন্য পরিখা দৃষ্ট হয়।

[২৯শ চিত্র—নাসাস্থিদ্বয়]

(সম্মুখ দৃশ্য)

* প্রত্যেক নাসাগুহা ত্রিতল এবং তিনটী স্রোত বা সুড়ঙ্গপথযুক্ত। সুড়ঙ্গপথগুলির বিশেষ বর্ণনা পরে লিখিত হইবে।

† ইং—Wormian Bones ওরমিয়ান্ বোনস্

* ইং—Nasal Bones—ন্যাসাল্ বোনস্

সন্ধি—প্রত্যেক নাসাস্থি পূর্ব্বোক্তরূপে চারিখানি অস্থির সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধহনুস্থি*—দুইখানি ঊর্দ্ধহনুস্থি পরস্পর সংহিত হইয়া তালুপটল ও দন্তোদূখল সহিত ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। নাসাকোটরদ্বয়, নেত্রপীঠদ্বয় এবং মুখমণ্ডলের সম্মুখ ও পার্শ্ব ভাগ প্রধানতঃ দুইটী ঊর্দ্ধহনুস্থি দ্বারাই নির্ম্মিত। আকারে বড় হইলেও এই অস্থিদ্বয় শূন্যগর্ভ বলিয়া হাল্‌কা।

প্রত্যেক হনুস্থির পাঁচটী অংশ, যথা মধ্যস্থলে হনুপিণ্ড এবং চতুঃপার্শ্বে চারিটী প্রবর্দ্ধন। উপরের প্রবর্দ্ধন নাসাকূট, বহিঃপার্শ্বের প্রবর্দ্ধন গণ্ডধরকূট, অন্তঃসীমার প্রবর্দ্ধন তালুফলক এবং অধঃসীমার প্রবর্দ্ধন দন্তোদূখল নামে অভিহিত। তন্মধ্যে—

(১) হনুপিণ্ড—হনুস্থির শূন্যগর্ভ মধ্যপিণ্ড। ইহা চারিটী তলবিশিষ্ট। তন্মধ্যে 'মৌখিকতল' বহির্মুখমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান, 'গণ্ডোত্তর' তল গণ্ডধরকূটের পশ্চাতে অবস্থিত, নেত্রপীঠতল নেত্রকোটরের ভূমিস্বরূপ এবং 'আন্তরতল' নাসাবিবর ও মুখবিবরের পার্শ্বপ্রাচীর স্বরূপ। ইহাতে নিম্নলিখিত বিবরগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। যথা—

[৩০শ চিত্র—ঊর্দ্ধহনুস্থি (বহিস্তল)]

হনুপিণ্ড—মৌখিকতল

(ক) মৌখিকতলে—নেত্রকোটরের নিম্ন প্রান্তে নেত্রাধরীয় নামে ছিদ্র আছে। উক্ত ছিদ্রপথ দিয়া নেত্রাধরীয় নাড়ী ও ধমনী নির্গত হইয়া থাকে।

(খ) গণ্ডোত্তরতল—এই নামীয় খাতের প্রাচীরস্বরূপ এবং অচ্ছদা পেশী দ্বারা আবৃত। গণ্ডোত্তরতলে 'পশ্চিম দন্তিকাখ্য নাড়ী' ও ধমনী প্রবেশের জন্য যে সকল ছিদ্র আছে, তাহারা 'পশ্চিমদন্তিক ছিদ্র' নামে অভিহিত। ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে হনুপশ্চিমার্ব্বুদ নামে

* ইং—Superior Maxillary Bones—সুপিরিয়র ম্যাক্সিলারি বোন্‌স্।

যে উচ্চাবচ উৎসেধ আছে, তাহা তাল্বস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

(গ) নেত্রপীঠতল—নেত্রকোটরের ভূমির সম্মুখভাগ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার অন্তঃসীমায় 'অশ্রুপীঠখাত' নামে যে খাত আছে, তথায় অশ্রুপীঠাস্থি সংহিত হয়। বহির্ধারা ঋক্ষরক ও তাল্বস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। বহিঃপ্রান্তে নেত্রাধরীয় পেশী ও ধমনী ধারণের জন্য সূক্ষ্ম খাত এবং 'অগ্রদন্তিক' নাড়ী প্রবেশের ছিদ্র আছে।

(ঘ) আন্তরতল—নাসাবিবর ও মুখবিবরের বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত। ইহার পুরঃসীমায় 'নাসাখাত' নামে যে মহৎ খাত আছে, তাহা তালুকলকের দ্বারা মধ্যদেশে দুইভাগে বিভক্ত—ঊর্দ্ধভাগ নাসাগুহার অংশ ও অধোভাগ মুখবিবরের অংশ। ইহার পার্শ্বে 'হনুগর্ভকোটর' নামে যে বৃহৎ কোটর আছে, তাহা নাসাগুহার মধ্যসুড়ঙ্গের সহিত সংমিলিত। জীবিত ব্যক্তির শরীরে এই কোটর ঋক্ষরক, শুক্তিকা ও তাল্বস্থি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও উহাতে একটী সূক্ষ্ম শলাকা প্রবেশের উপযুক্ত দ্বার থাকে এবং উহার অভ্যন্তরভাগ কলাবিশেষের দ্বারা আবৃত থাকে। পীনস রোগে কখন কখন এই হনুগর্ভকোটরে পূয়সঞ্চার হইয়া বিদ্রধি উৎপন্ন হয়।

(২) নাসাকূট—নাসামূলের পার্শ্বগত প্রবর্দ্ধন। ইহা ঊর্দ্ধে পুরঃকপালের সহিত মধ্যরেখায় নাসিকাস্থির সহিত ও বহিঃসীমায় অশ্রুপীঠাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার অন্তস্তল নাসিকার মধ্যসুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের জন্য খাতোদর এবং দুইটী রেখাযুক্ত; রেখাদ্বয়ের একটীর সহিত ঋক্ষরাস্থির মধ্য শুক্তিকা ভাগ ও অপরটীর সহিত অধঃশুক্তিকাস্থি সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে যে পরিখা আছে, তাহা 'অশ্রুবাহিকা' স্রোতঃ ধারণ করিয়া থাকে। এই অশ্রুবাহিকা স্রোতঃপথে রোদনকালে অশ্রুজল নাসিকায় প্রবেশ করে।

(৩) গণ্ডধরকূট—ইহা বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত ত্রিকোণাকার উৎসেধ—ইহা গণ্ডাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

(৪) তালুফলক—তালুর সম্মুখভাগ নির্ম্মাণকারক ও হনুপিণ্ডের অন্তস্তল হইতে উদ্গত। ইহার ঊর্দ্ধতল নাসাভূমি এবং তালুর ছাদ স্বরূপ। মধ্যরেখায় ইহা অপর ঊর্দ্ধহনুস্থির তালুফলকের সহিত সংসক্ত থাকে এবং এইরূপে সংহিত ফলকের মধ্যরেখার অধস্তল সম্মুখভাগে অধস্তলে 'অগ্রতালুখাত' নামে একটী খাত দেখা যায়। উক্ত খাতে যে চারিটি ছিদ্র আছে তাহাদের ভিতর দিয়া নাসা ও তালুগামিনী নাড়ী ও ধমনী সকল তালুতে প্রবেশ করিয়া থাকে। উক্ত সন্ধিরেখার ঊর্দ্ধতলে সম্মুখ দিকে যে সমুন্নত রেখা আছে, তথায় সীরিকাস্থি সংহিত হয়। তালুফলকের পশ্চিম ধারার সহিত তাল্বস্থির হ্রস্বপত্রক নামক অংশ সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

(৫) দন্তোদূখলিক—দন্তোদূখলধারক অর্দ্ধচন্দ্রাকার অধোমুখ প্রবর্দ্ধনের নাম "দন্তোদূখলিক"। ইহাতে বাল্যে পাঁচটী ও যৌবনে আটটী দন্তোদূখল থাকে এবং ঐ সকল উদূখলে বা কোটরে সমসংখ্যক দন্ত নিবিষ্ট থাকে।

সন্ধি—প্রত্যেক ঊর্দ্ধহনুস্থি অপর ঊর্দ্ধহনুস্থি, ঋক্ষরক, পুরঃকপাল, গণ্ডাস্থি,

নাসাস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি, সীরিকাস্থি, তালুস্থি ও শুক্তিকাস্থি—এই নয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

পেশী—প্রত্যেক ঊর্দ্ধ হনুস্থিতে এগারটি করিয়া পেশীর সংযোগ আছে। এই সকল পেশী নেত্রের উন্মীলন ও নিমীলন, নাসা ও অধরের সঙ্কোচন ও বিস্ফারণ এবং চর্ব্বণাদি কার্য্য করিয়া থাকে।

[৩১শ চিত্র—ঊর্দ্ধহনুস্থি (অন্তস্তল)]

অশ্রুপীঠাস্থি*—অশ্রুপীঠ নামক ক্ষুদ্রাস্থি নাসাস্থির ও ঊর্দ্ধহনুস্থির নাসাকূটের পশ্চাতে অক্ষিকোটরপার্শ্বে দুইদিকে দুইখানি গূঢ় ভাবে অবস্থিত। উহারা পাতলা পত্রবৎ অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত এবং দেখিতে কতকটা অর্ঘ্যপাত্র বা কোশার ন্যায়। 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালী ধারণ করে বলিয়া উহারা অশ্রুপীঠ নামে অভিহিত।

প্রত্যেক অশ্রুপীঠের দুইটী তল—বহিস্তল ও অন্তস্তল। বহিস্তলে অশ্রুস্রোত ধারণের জন্য অশ্রুবাহিকা প্রণালীর খাঁজ দেখা যায়। অন্তস্তল ঝর্ঝরাস্থির কোটরদ্বারের আচ্ছাদন স্বরূপ।

[৩২শ চিত্র—অশ্রুপীঠাস্থি(বহিস্তল)]

প্রত্যেক অশ্রুপীঠের চারিটী ধারা। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ ধারার সহিত পুরঃকপালাস্থি, অধোধারার অগ্রভাগস্থিত অঙ্কুশাকার প্রবর্দ্ধনকের সহিত শুক্তিকাস্থি, সম্মুখ ধারায় ঊর্দ্ধহনুস্থির নাসাকূট এবং পশ্চিম ধারায় ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃপীঠ সংহিত হইয়া থাকে।

গণ্ডাস্থি* — বাণাগ্রফলকের ন্যায়

* ইং—Lachrymal Bones—ল্যাক্রিম্যাল বোন্‌স্।

* ইং—Malar Bones—মেলার বোন্‌স্।

আকৃতি বিশিষ্ট দুই খানি গণ্ডাস্থি গণ্ডদেশে অবস্থিত। উহাদের দ্বারা গণ্ডদেশের উৎসেধ-দ্বয় ও নেত্রকোটরভূমির কিয়দংশ নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক গণ্ডাস্থির দুইটী তল—বহি-স্তল ও অন্তস্থল। তন্মধ্যে—

[৩৩শ চিত্র—বামগণ্ডাস্থি (বহিস্তল)]

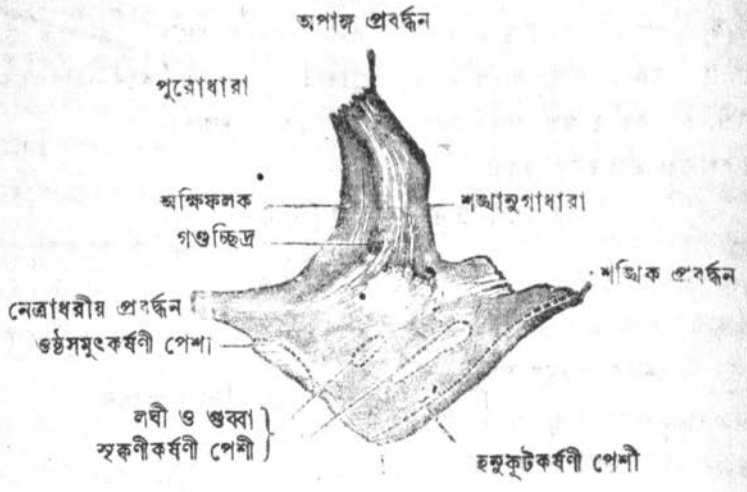

গণ্ডকূটের অধঃকোটি

বহিস্তল—ন্যুব্জপৃষ্ঠ এবং নাড়ী ধমনী নির্গমের জন্য 'গণ্ডচ্ছিদ্র' নামক ছিদ্র বিশিষ্ট। ইহা দ্বারা 'গণ্ডকূট' বা গালের উন্নত প্রদেশ নির্ম্মিত হয়।

অন্তস্তল—কোরোদর। ইহার বক্ষুর ত্রিকোণাকার অংশে উর্দ্ধ হনুস্থির গণ্ডধরকূট সংহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক গণ্ডাস্থির চারিটী প্রবর্দ্ধন আছে। তন্মধ্যে তিনটী যথাক্রমে সম্মুখ, পশ্চাৎ ও উর্দ্ধ কোটিরূপে অবস্থিত এবং একটী অক্ষিকোটর ভূমিতে প্রবিষ্ট। তন্মধ্যে—

(১) 'নেত্রাধরীয়' নামক সম্মুখ প্রবর্দ্ধন সূক্ষ্মাগ্র ও উর্দ্ধ হনুস্থির সহিত নেত্রের নিম্ন-ভাগে সংহিত।

(২) 'শঙ্খিক' নামক পশ্চাৎ প্রবর্দ্ধন শঙ্খাস্থির গণ্ডপ্রবর্দ্ধনের সহিত সংহিত।

(৩) উর্দ্ধ প্রবর্দ্ধন অপাঙ্গাভিমুখ বলিয়া 'অপাঙ্গ প্রবর্দ্ধন' নামে খ্যাত। ইহা পুরঃ-কপালের বাহ্য কোণের সহিত সংহিত হয়।

(৪) নেত্রভূমিগত প্রবর্দ্ধন উর্দ্ধপ্রবর্দ্ধন ও পুরঃপ্রবর্দ্ধনের মধ্যস্থিত এবং অক্ষিকোটর ভূমির অংশ ভূত। ইহা 'অক্ষিফলক' নামে খ্যাত ও ঈষৎ খাতোদর। ইহাতে নাড়ী প্রবেশের জন্য 'শঙ্খগণ্ডক' নামক একটী রন্ধ্র মার্গ আছে, উহা গণ্ডচ্ছিদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষিফলকের ধারা পশ্চাতে জতুকাস্থির সহিত সংহিত হয়।

গণ্ডাস্থির অধঃকোটি কোন অস্থির সহিত

সংহিত হয় না—ইহা গণ্ডকূটে ত্বকের নিম্নে অনুভব করা যায়।

সন্ধি—প্রত্যেক গণ্ডাস্থি শঙ্খাস্থি, পুরঃকপাল ঊর্দ্ধহনুস্থি ও জতূকাস্থি—এই চারিখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

পেশী—প্রত্যেক গণ্ডাস্থিতে পাঁচটী করিয়া পেশী সংসক্ত। যথা, বহিস্তলে ওষ্ঠ সমুৎকর্ষণী, এবং লঘু ও গুরু সুক্কনীকর্ষণী; অন্তস্তলে শঙ্খাচ্ছদা এবং হনুকূটকর্ষণী।

তাল্বস্থি*—নেত্র ও নাসাকুহরের পশ্চাতে খনিত্র বা কোদালের ন্যায় আকার বিশিষ্ট পাতলা পত্রবৎ অস্থি নির্ম্মিত দুইখানি তাল্বস্থি অবস্থিত। ইহারা নেত্রকোটরভূমি, নাসাভূমির পার্শ্বদ্বয় এবং তালুঘটন নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়া থাকে। প্রত্যেক তাল্বস্থির পাতলা পত্রময় দুই অংশ—দীর্ঘপত্রক এবং হ্রস্বপত্রক। তন্মধ্যে—

[৩৪শ চিত্র—তাল্বস্থি (বাম)]

(পশ্চাৎ হইতে দৃষ্ট)

(১) দীর্ঘপত্রক—নেত্রকোটরের ভিতর দিক হইতে তালুমূল পর্য্যন্ত আলম্বিত। ইহার সম্মুখধারা ঊর্দ্ধহনুস্থির পিণ্ডভাগের পশ্চাতে সংহিত। পশ্চিম ধারা দুই মুখ বিশিষ্ট এবং জতূকাস্থির চরণফলকদ্বয়ের মধ্যে সংহিত। ইহার অন্তস্তল মসৃণ এবং সমুন্নত দুইটী রেখা বা আলি দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। 'উত্তরালিকা' নামক ঊর্দ্ধস্থিত আলির সহিত ঋক্ষরাস্থি মধ্যশুক্তিকা নামক অংশ সংহিত হইয়া থাকে। 'অধরালিকা' নামক অধঃস্থিত আলির সহিত অধঃশুক্তিকাস্থি সংহিত হয়। উক্ত আলি-দ্বয়ের মধ্যদেশ নাসিকার মধ্য সুড়ঙ্গের সহিত মিলিত এবং উহার ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ নাসিকার ঊর্দ্ধ ও অধঃ সুড়ঙ্গের সহিত সংলগ্ন।

দীর্ঘপত্রকের বহিস্তল ঊর্দ্ধহনুস্থির আভ্যন্তর তলের সহিত সংহিত হইয়া থাকে। উহাতে 'পশ্চিমতালুকা' নামক সূক্ষ্ম প্রণালী আছে।

* ইং—Palate Bones—প্যালেট বোন্‌স।

দীর্ঘপত্রকের চূড়ায় সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত দুইটী প্রবর্দ্ধনক আছে। তন্মধ্যে সম্মুখ দিকে বিস্তৃত প্রবর্দ্ধনক নেত্রকোটর-ভূমিতে প্রবেশ করে এবং জতূকা, ঋর্ঝরক ও ঊর্দ্ধহনুস্থির নেত্রপীঠফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। পশ্চাৎদিকে বিস্তৃত প্রবর্দ্ধনকের সহিত জতূকাস্থি সংহিত হয়। উভয় প্রবর্দ্ধনকের সন্ধিস্থলে 'তালুজাতক' নামে যে খাত আছে, তাহার ভিতর দিয়া নাড়ী ও ধমনী নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করে।

(২) হ্রস্বপত্রক দীর্ঘপত্রকের মূল হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে উদ্গত ও অন্তর্মুখ। ইহার ঊর্দ্ধতল নাসাভূমির এবং অধস্তল তালুপটলের পশ্চাদ্‌ভাগ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার সম্মুখ ধারা ঊর্দ্ধহনুস্থির তালুফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত; পশ্চাৎ ধারা মুক্ত, ইহা কোমল তালুর কিয়দংশ ও কাকলক (আল্‌জিব) ধারণ করে।

প্রত্যেক হ্রস্বপত্রকের অগ্রভাগ অপর তাল্বস্থির হ্রস্বপত্রকের সহিত সন্ধিযুক্ত হয় এবং উভয় সন্ধিরেখার উপর পৃষ্ঠে সীরিকাস্থি সংহিত হইয়া থাকে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ পত্রকদ্বয়ের সন্ধিকোণ 'তালুকোণ' নামে অভিহিত।

সন্ধি—প্রত্যেক তাল্বস্থি নিম্নলিখিত ছয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা, ঋর্ঝরক, জতূকা, শুক্তিকা, সীরিকা ঊর্দ্ধহনুস্থি এবং অপর তাল্বস্থি।

পেশী—প্রত্যেক তাল্বস্থিতে চারিটী করিয়া পেশী সংসক্ত থাকে। যথা উত্তরা কণ্ঠসঙ্কোচনী, অধরা হনুকূটকর্ষণী, কাকলকধরা এবং তালুতংসনী।

শুক্তিকাস্থি*—(২৯শ চিত্রে দেখ) শুক্তিকাস্থি বা অধঃশুক্তিকাস্থি পাতলা ও ছিদ্রযুক্তপত্রময় এবং দেখিতে ক্ষুদ্র দীর্ঘ শুক্তিকা বা ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। দুইখানি শুক্তিকাস্থি দুই নাসাগুহার নিম্ন ও মধ্য সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। ইহারা ঋর্ঝরকাস্থির শুক্তিকাফলকদ্বয় অপেক্ষা নিম্নদিকে অবস্থিত বলিয়া কখন কখন অধঃশুক্তিকা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক শুক্তিকার দুইটী তল—অন্তস্তল ও বহিস্তল। তন্মধ্যে অন্তস্তল কোরোদর ও নাসাপথের নিম্ন সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণকারক। বহিস্তল ন্যুব্জপৃষ্ঠ এবং নাসিকার মধ্যপ্রাচীরের অভিমুখ।

শুক্তিকাস্থির ঊর্দ্ধধারা সম্মুখভাগে ঊর্দ্ধহনুস্থির সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে তাল্বস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। শুক্তিকাস্থির 'অশ্রুকূটক' ও 'ঋর্ঝরকূটক' নামে দুইটী প্রবর্দ্ধন আছে। তন্মধ্যে অশ্রুকূটক অশ্রুপীঠাস্থির সহিত এবং ঋর্ঝরকূটক ঋর্ঝরাস্থির সহিত সংহিত। শুক্তিকাস্থির অধোধারা বিমুক্তাগ্র অর্থাৎ কাহারও সহিত সহিত সন্ধিযুক্ত নহে।

সন্ধি—শুক্তিকাস্থি নিম্নলিখিত চারিখানি অস্থির সহিত কেবল উপরদিকে সন্ধিযুক্ত যথা, ঋর্ঝরকাস্থি ঊর্দ্ধহনুস্থি, তাল্বস্থি এবং অশ্রুপীঠাস্থি।

সীরিকাস্থি*—সীরিকা বা সীরাগ্রিকা নামক ক্ষুদ্র দীর্ঘ অস্থিখণ্ড সীর বা

* ইং—Inferior Turbinated Bones—ইন্‌ফিরিয়র টরবাইনেটেড্ বোন্‌স্।

ইং—Innferior Maxillary Bones—ইন্‌ফিরিয়র্ ম্যাক্সিলারি বোন্‌স্।

লাঙ্গলের অগ্রসদৃশ ও পত্রবৎ পাতলা। ইহা নাসিকাদ্বয়ের মধ্যে পশ্চাদ্ ভাগে মধ্যপ্রাচীর রূপে অবস্থিত। ইহার অগ্রধারায় ঝর্ঝর-কাস্থির নাসাগ্রপ্রাচীরভূত মধ্যফলক এবং ত্রিকোণ তরুণাস্থি সংসক্ত থাকে। পশ্চিম ধারা গলবিবরাভিমুখী এবং বিমুক্তাগ্র। অধোধারা উর্দ্ধহনুস্থিদ্বয়ের তালুফলক যুগ্মের এবং তাল্বস্থিদ্বয়ের পরস্পর সন্ধান রেখায়

[৩৫শ চিত্র—সীরিকাস্থি]

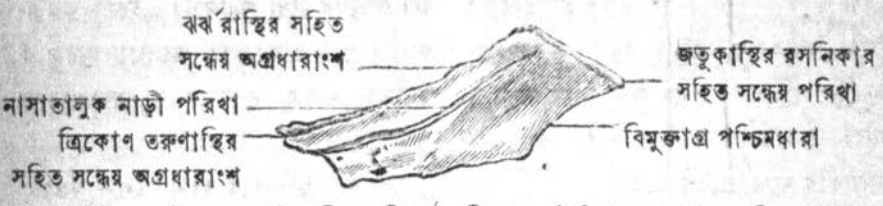

সংহিত অর্থাৎ—এইখানে চারিখানি অস্থির সহিত ইহার সন্ধি হয়। উর্দ্ধধারা দুইটী তটযুক্ত পরিখা বিশিষ্ট, জতুকাস্থির নিম্নতলস্থ রসনিকাখ্য উন্নত আলি এই পরিখায় সংহিত হয়।

সীরিকাস্থির পার্শ্বে 'নাসাতালুকা' নাড়ী ধারণের জন্য দুইটী সূক্ষ্ম পরিখা আছে।

সন্ধি—সীরিকাস্থি ছয় খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত যথা উর্দ্ধহনুস্থিদ্বয়, ঝর্ঝরক এবং জতুকাস্থি।

অধোহনুস্থি*—অধোহনুস্থি এক-খানি মুখমণ্ডলের সমস্ত অস্থি অপেক্ষা বৃহৎ ও দৃঢ় এবং অধোদন্তপংক্তির আশ্রয় স্বরূপ। ইহার দুইটী অংশ—অশ্বখুরের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট 'হনুমণ্ডল' এবং উভয়দিকে হনুসন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট উর্দ্ধমুখ 'হনুকূটদ্বয়'। তন্মধ্যে—

(১) হনুমণ্ডল—মুখমণ্ডলের অধঃসীমা নির্ম্মাণকারক এবং অধোদিকের দন্তোদূখল ধারক। বাল্যাবস্থায় হনুমণ্ডল বামে ও দক্ষিণে অর্দ্ধার্দ্ধভাবে পৃথক্ অবস্থিত থাকে। পরে যৌবনে চিবুকদেশে সংহত হইয়া এক হয়। ইহার দুইটী তল—বাহ্যতল ও অন্তস্তল এবং দুইটী ধারা—উর্দ্ধধারা ও অধোধারা। বাহ্যতলের চিবুকদেশে 'চিবুকপিণ্ড' নামে যে উৎসেধ আছে, তাহার উভয় দিকে 'অধরোৎ-ক্ষেপনী' পেশীদ্বয় সংসক্ত থাকে। চিবুক-পিণ্ডে সন্ধির যে রেখা আছে তাহাকে 'চিবুকসন্ধানিকা' বলে। চিবুকপিণ্ডের পশ্চাতে উভয়দিকে 'অনুচিবুক' নামে যে দুইটী বিবর আছে, উহাদের ভিতর দিয়া 'অনুচিবুকা' সংজ্ঞক নাড়ী, সিরা ও ধমনী প্রবেশ করিয়া থাকে। উক্ত বিবর দুইটির মূল হইতে পশ্চানুখী তির্য্যক্ রেখা দুইটীকে "বাহ্য তিরশ্চীনা" বলে। এই রেখা দুইটীর উপ-কণ্ঠে 'অধরাবনমনী' ও 'কৃকাটীনমনী' পেশীদ্বয় এবং নিম্নভাগে অধোধারার নিকটে 'গল-পার্শ্বচ্ছদা' পেশী সংলগ্ন থাকে।

অন্তস্তল সর্ব্বত্র ঈষৎ খাতোদর এবং উহার মধ্যরেখার উভয় দিকে 'রসনাকলায়ক' নামে দুইটী কলায়াকার উৎসেধ আছে।

(ক্রমশঃ)

---

* ইং—Vomer—ভোমার্।

কচু।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ]

:•:

(ফ) মানকচু।

(Alocasia Indica).

বাঙ্গালী পাঠকের কাছে "মানকচুর পরিচয় দেওয়া বৃথা। এ কচু যিনি না চিনেন, তিনি নিশ্চয়ই "কচু পোড়া" খাইয়াছেন। মানকচুর সংস্কৃত নাম মানক, স্থলপদ্ম, মহাপত্র। মহারাষ্ট্রী নাম কচ্ আলু, কর্ণাট ভাষা ইহাকে ভোগনামা বলে। ভারতবর্ষে অনেক শ্রেণীর মানকচু দেখিতে পাওয়া যায়। সকল শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। মানের অনেক গুণ;—মান মূত্ররেচক, মূত্রকারক, বর্ম্মকারক, শোথহারক, পিত্তনাশক, রক্তবর্দ্ধক শীতবীর্য্য এবং লঘু। মানের কন্দ, কাণ্ড প্রভৃতি সমস্ত অংশই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবিরাজ মহাশয়দের "মানমণ্ড" একটী মহৌষধ, এবং উৎকৃষ্ট পথ্য। "মানমণ্ড" খাইয়া—আমি অনেক শোথ রোগী, প্লীহারোগী ও উদর রোগীকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে দেখিয়াছি। অনেক বিচক্ষণ ডাক্তার এই সকল রোগীর জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেকালের প্রাচীন ডাক্তারগণ—যাঁহারা ব্যবসায়ের খাতিরে মুখে আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা করিতেন—তাঁহারাও আয়ুর্ব্বেদের "মানমণ্ড" রোগীকে ব্যবস্থা করিতেন। বাস্তবিক রক্তাল্পতায়, যকৃৎ বিকৃতিতে মানমণ্ডের মত উৎকৃষ্ট পথ্য দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ২ভাগ মানকচুর গুঁড়া, ১ ভাগ আতপ চাউলের গুঁড়া উপযুক্ত দুগ্ধ এবং চিনির সহিত পায়েসর মত পাক করিলে মানমণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"মানকচু" খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া চিনির রসে পাক করিলে এক রকম 'মুড়কী' প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মুড়কী রোগীর পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট পথ্য। খাইতেও সুস্বাদু। "মানাদি গুড়িকা" প্লীহা যকৃৎ, শোথ এবং পুরাতন গ্রহণীর ফলপ্রদ ঔষধ। মানের পত্রদণ্ডের রস কাণে দিনে—কর্ণশূল ও পুতিকর্ণ রোগ ভাল হয়। মান কচু হইতে সূতার মত একপ্রকার শিকড় বাহির হইয়া থাকে, এই শিকড় শুকাইয়া ভস্ম করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া লাগাইলে—অতি ভীষণ মুখক্ষতও ২।৩ দিনে ভাল হইতে পারে। মানকন্দের রস গণ্ডীর মত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে ইরিসিপ্লাস্ রোগের বিসর্পণ বন্ধ হইয়া যায়। ডাক্তার জগবন্ধু বসু মহাশয়কে ইহা আমি ব্যবস্থা করিতে দেখিয়াছি। কেবলমাত্র মানকচু চূর্ণ আধতোলা পরিমাণ লইয়া,—এক ছটাক গরম জলের সহিত প্রত্যহ খালি পেটে খাইলে—প্লীহাদি

আর বাড়িতে পায় না। মানকচু অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম তৈল ও লবণ সহ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয়। মানের পত্রবৃন্তের রস সঙ্কোচক এবং রক্ত রোধক। ডাঁটাটি অগ্নিতে সেঁকিয়া রস বাহির করিতে হয়। মানের দণ্ড পচিয়া গেলে—তাহার রস ঘুঁটের ছাই সহ প্রলেপ দিলে পাদশোথ ভাল হয়। মানকচু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া, উহা কাপড়ে পুটলী বাঁধিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে বাতরোগের বেদনা ও যন্ত্রণা দূর হয়।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে 'বিজয়া দশমীর' পর সার্দ্ধ দুই দিবস পর্য্যন্ত শিবরাণী দুর্গা নাকি মানতলায় বাস করিয়া থাকেন। এই জন্য অনেক গৃহস্থ বাড়ীর সামনে, খিড়কীর দ্বারে মানগাছ পুঁতিয়া রাখেন। পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থানেই দেখিয়াছি প্রবীণা গৃহিণীগণ বিজয়ার পরই আঙ্গিনায় মানগাছ ও হরিদ্রা গাছ রোপন করেন। মহাদেব ভগবতীকে মর্ত্তধামে আসিতে দিতে সম্মত ছিলেন না, দুর্গা জোর করিয়া চলিয়া আসেন। দশমীর পর যখন দেবী স্বামীসহ কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন,—শিব তখন বাধা দেন। তাই দেবী মান করিয়া মানতলায় আড়াই দিন বসিয়া ছিলেন। তার পর দাম্পত্য কলহের নিবৃত্তি হয়। শিব-দুর্গা কৈলাস যাত্রা করেন। এই প্রবাদটী স্মরণ করিয়া বহু গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মীগণ মান গাছকে অতি পবিত্র ভাবিয়া থাকেন। দুর্গোৎসবের "নব পত্রিকায়" মান ও কচুর গাছ গৃহীত হইয়া থাকে।

মানের চাষ বেশ লাভজনক ব্যবসায়। এক একটী মান ১০।১২ সের হইতে একমণ পর্য্যন্ত ওজনের হইতে দেখা যায়।

(ব) কৃষ্ণকচু।

ইহাও একপ্রকার বন্য কচু। সিক্ত ভূমিতে আপনা হইতে জন্মে। ইহার পাতা, বৃন্ত সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ। কন্দ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক প্রতান বহির্গত হইয়া থাকে। ইহার বৃন্ত শাকের মত রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। এই কচুর আঠার প্রলেপ দিলে শিশুদের নাভিপাক ভাল হয়, নালী ঘা শুকায়, বাঘী বসিয়া যায়। নখ দিয়া মূল ছেদন করিলে, দুগ্ধবৎ আঠা বাহির হয়।

(ভ) চড়কচু।

এক জাতীয় বন্য কচু। ইহার পত্র ও পত্রবৃন্ত নীলাভ কৃষ্ণ। গুণ পূর্ব্বোক্ত কচুর মত। ইহার বৃন্ত শাকের মত খাওয়া চলে।

(ম) বড়িয়াকচু।

ইহার আর একটী নাম—দন্তর কচু। পত্র গোলাকার, পত্রের ব্যাস দেড় ফুট হইতে ২ ফুট। বৃন্ত অত্যন্ত স্থূল। ইহার কন্দ নাই বলিলেই হয়,—ইহার ডাঁটা খাওয়া চলে।

(য) বিষকচু।

(Arum Fornicatum)

এই কচু বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বনে জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে। পত্র গাঢ় সবুজ বর্ণ, মূল আঁইস যুক্ত—অনেক সময় মূল—মৃত্তিকার উপরেই বিস্তৃতি লাভ করে।

এই কচু একেবারেই অখাদ্য। ইহার রস গায়ে লাগিলে গা চুল্‌কায় ও ফুলিয়া উঠে। কিন্তু ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে—হাঁটুর

বাত ভাল হয়। ফোড়া বসিয়া যায়। এই কচু তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল ক্ষতে দিলে ক্ষত শুকায়। বিষকচুর অনেক জাতি আছে। যথা—ঢোঁড়া কচু, সাপ কচু, ডাঙ্গা কচু, আড়াই কচু, ইত্যাদি। কোন কোন দেশে—ইহাকে ঘেঁচু বলিয়া থাকে। ঘেঁচু জাতীয় বিষকচুর ফুল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। পল্লীগ্রামে বর্ষাকালের সন্ধ্যায়—এই ফুলের দুর্গন্ধ বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফুল রক্তবর্ণ—দীর্ঘাকর, সূক্ষ্মাগ্র,—এই ফুলের বৃন্ত গ্রন্থিল এবং পীতবর্ণ। ইহার নাম ঘেঁটফুল।*

(র) রঞ্জনকচু।

(Caladium)

প্রায় ৩০ প্রকার রঞ্জন কচু আমি দেখিয়াছি। এই জাতীয় কচুর পত্রগুলি—শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, প্রভৃতি বর্ণদ্বারা সুরঞ্জিত। দেখিতে সুন্দর ও শোভন বলিয়া বিলাসী বাবুদের বাগানে সুরক্ষিত হয়। ইহার কোন কোন জাতীয় গাছ ১৫৲ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইয়া থাকে। এই সকল কচু—কতক ভারতের, কতক জাপান প্রভৃতি ভিন্ন দেশ হইতেও আসিয়াছে। এই কচু কেহই খায় না। কেবল শোভার জন্য—ইহার আদর। পারি ত পরে ইহাদের পৃথক পরিচয় দিব।

ওলকচু।

(Amerphallus Campanulatum
Syn. Colocasia camputanulata.
Telunga Potato.)

য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকগণ ওলকেও কচু শ্রেণীর মধ্যে ধরিয়াছেন। ওল দ্বিবিধ। শ্বেত ও রক্ত। যে ওল কচু ছেদন করিলে রক্তাভ ধবল বর্ণ শস্য দেখা যায়, তাহার নাম রক্ত ওল। শ্বেত ওল ছেদন করিলে পীতাভ শ্বেতবর্ণ শস্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত ওল সুখাদ্য—তত গলা ধরেনা। রক্ত ওল প্রায়ই কুটকুটে হইয়া থাকে। চাষের গুণে কোন কোন রক্তওল খাদ্যোপযোগী হইতে পারে। ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিনা চাষে অযত্ন সম্ভূত ওল জন্মিয়া থাকে।

পাঠকগণের কাছে ওলবৃক্ষের পরিচয় দেওয়া ধৃষ্টতা, কেননা ওলগাছ দেখেন নাই, এমন বাঙ্গালী আছেন বলিয়া মনে হয় না। ওলকন্দ স্বভাবতঃ গোলাকার। এই কন্দ হইতে বহু সংখ্যক স্ফীত গুটিকাবৎ মুখী বাহির হয়। ইহার ইংরাজী নাম Eye or tuber এই গুটীগুলি—ওলের বীজ স্বরূপ অর্থাৎ ইহা হইতেই নূতন গাছের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ওলের ফুল খুব বড়, বর্ণ সবুজ ও বেগুনে মিশ্রিত, দেখিতে অতি সুন্দর।

ওলের সংস্কৃত নাম—শূরণ, স্থূলকন্দক কন্দ, অর্শোঘ্ন, কণ্ডূল ইত্যাদি। ইহাকে সিংহলবাসীরা—ফিডায়ণ, হিন্দুস্থানীরা শূরণ, আসামীগণ ওলকচু, তৈলঙ্গীগণ মঞ্চাকান্দা, মহারাষ্ট্রীরা পোড়াশূণ, তামিলীগণ, শূর্ণা, গুজরাটবাসীরা শূরণ এবং পারস্যবাসীগণ ওলকন্দ বলিয়া থাকেন।

গ্রাম্য এবং বন্য ভেদে ওল আবার দুই প্রকার। যে ওলের চায় করা হয়, তাহাই গ্রাম্য—যে ওল আপনা হইতে জন্মে তাহার নাম বন্য।

* প্রসবের পর স্ত্রীজাতিকে ঘেঁটফুলের ঝোল খাওয়াইলে জরায়ুর দোষ নষ্ট হইয়া থাকে—এইরূপ শুনিয়াছি। আঃ, সং।

ওল—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কণ্ডু কারক, বিষ্টম্ভী, রুচিকারক—কফ, অর্শ, প্লীহা ও গুল্মরোগে—হিতকারী। বন্যওল—ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শোরোগে—ওল সুপথ্য এবং একটী মহৌষধ। শূরণ খণ্ড, শূরণ পিণ্ড—প্রভৃতি ঔষধের ওল একটী প্রধান উপাদান। ওল দগ্ধ করিয়া লবণসহ ভক্ষণ করিলে—অর্শের রক্তস্রাব ও যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে। তৈল, লঙ্কা, সর্ষপ প্রভৃতি সংযোগে—ওল পিত্তবর্দ্ধক হয়, উহার উপকারিতাও নষ্ট হয়।

ওল অত্যন্ত বলকারক, এবং পাচক, ইহা দ্বারা শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, শূল, দন্ত রোগ এবং গ্রহণীরোগ—ভাল হইয়া থাকে, কুচরিত্রা নারীগণ ওলের ফুল ও চিতামূল বাটিয়া খাইয়া গর্ভপাত করিয়া থাকে। গর্ভপাত করিতে গিয়া অনেক সময় গর্ভিণীরও পঞ্চত্ব ঘটে।

পূর্ব্ববঙ্গে একরকম ওল পাওয়া যায়, তাহার নাম 'বাক্'। ইহার ইংরাজী নাম—Telinga potato—এই ওল টেলিঙ্গা পোটেটো নামক উদ্ভিদের মূলের অনুরূপ। ইহারই সংস্কৃত নাম 'রুচাকন্দ'। এই ওল সিদ্ধ করিয়া খাইলে অগ্নিবান্দ্য সারে।

ওলের ডাঁটা—কোমল অবস্থায় অর্থাৎ যখন পত্রগুলি ছত্রাকারে বিস্তৃত হয় নাই—অতি সুখাদ্য। ইহা সিদ্ধ করিয়া সরিষা বাটা ও কিছু গুড় মাখিয়া, সরিষার তৈলে সরিষা ফোড়ন দিয়া তাহাতে ঐ ওলের কোঁড়া ভাজিয়া লইতে হয়। ইহা বড় মুখপ্রিয়। ওলের কন্দ—ডালনা করিয়া ভাতে দিয়া, কখনও বা সিদ্ধ করিয়া মসলা মাখিয়া বড়ার মত ভাজিয়া খাওয়া যায়।

স্মৃতিশাস্ত্রে কার্ত্তিক মাসে ওল ভক্ষণের নিষেধ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি, জানি না। এদেশ প্রচলিত একটী ছড়ায় কিন্তু কার্ত্তিক মাসেই ওল খাইবার ব্যবস্থা আছে। যথা—

ভাদ্রমাসে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠে।
কার্ত্তিকে খাইবে ওল, অঘ্রাণে খলিসার ঝোল॥
পৌষে কাঁজি,মাঘে তেল,ফাল্গুনে গুড় আদা বেল।
চৈত্রে নিম গিমা তিতা, বৈশাখে ঘৃত নালিতা।
জ্যৈষ্ঠে দই, আষাঢ়ে দই।
শ্রাবণে ঘোল চাল্‌তা, তবে হয় শরীরের কান্তা॥

বনে জঙ্গলে আর এক প্রকার ওল পাওয়া যায়, তাহার কাণ্ড (ডাঁটা) বিচিত্র বর্ণ। এই ওল আদৌ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলে না। ইহা ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া, অম্লরস দিয়া,—অতিরিক্ত লঙ্কা মাখিয়াও দেখা গিয়াছে—আস্বাদ মাত্র ভোক্তার মুখ দিয়া 'গোটানাল' ভাঙ্গিয়া থাকে। ইহার কিন্তু একটী গুণ আছে—এই ওল চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে—বৃশ্চিক দংশন জনিত অসহ্য যন্ত্রণার তৎক্ষণাৎ উপশম হইয়া থাকে।

যে ওল ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মে—তাহাতে অত্যন্ত মুখ চুলকায়। খনার বচনেও আছে "ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ।" কিন্তু ছায়ার ওল অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া থাকে।

এদেশে আরও দুই রকম কচু দেখিতে পাওয়া যায়। ১। "অমর্ত্তমান"। ২ কাঁটুরে। অমর্ত্তমানের ডাঁটা সুখাদ্য। কাঁটুয়ের পত্র বৃন্ত কণ্টক ময়। ইহা অখাদ্য।

শিশুপালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ সরস্বতী]

নিদ্রা ও আহারের ন্যায় ব্যায়ামও শিশুর জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ক্ষুদ্র শিশু তাহার ক্ষুদ্র শয্যায় শুইয়া কেমন আনন্দে হাত পা ছুড়িয়া খেলা করে। ক্ষুদ্র শিশু ব্যায়ামের কিছুই জানেনা, কিন্তু বিধাতা তাহার দেহরক্ষার জন্য তাহাকে এই ব্যায়াম করাইতেছেন। সেই অসহায় অবস্থায় বিধাতা তাহার দ্বারা এইরূপ ব্যায়াম না করাইলে শিশুর দেহ কখনো বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইত না। শিশুর জীবনের জন্য ব্যায়াম কত আবশ্যক এতদ্বারা বিধাতা আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দেন। আমরা অনেক সময় এ শিক্ষা ভুলিয়া যাই। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তাও যে বাড়ীতে থাকে সে কথা আমাদের স্মরণ থাকে না। পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ ব্যায়ামের গুণ বিলক্ষণ অবগত আছেন বলিয়াই পনের দিনের শিশু হইতে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধকে পর্য্যন্তও ব্যায়াম করিতে দেখা যায়। আহার নিদ্রার ন্যায় ব্যায়ামও তাঁহাদের জীবনের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে একটি প্রধান কর্ম্ম বলিয়া তাহা যত্নের সহিত পালন করেন। তাই তাঁহারা শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য আজ ভুবন বিখ্যাত। তাই তাঁহাদের দীর্ঘ ও উন্নত দেহ, বিশাল বক্ষ, দৃঢ় ও বলশালী বাহুযুগল দেখিয়া তাঁহারা কোন্ এক উন্নত লোকের জীব বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়। শক্তি দেবী যেন তাঁহাদের দাসী। দেহ বলশালী হইলে মনও তেজস্বী ও মহৎ হয়, প্রাণ অগ্নিময় হয়। মানুষ তখন অসাধ্য সাধন করিতে ছুটিয়া চলে। উদ্দেশ্য সাধন করিবার পথে কোন অন্তরায়কেই তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। আর দুর্ব্বল, মেরুদণ্ড বাঁকা, শীর্ণকায়, রোগক্লিষ্ট হইলে মনও ভীরু, কাপুরুষ হয়, কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, কার্য্য করিবার পথে সামান্য বাধা উপস্থিত হইলেই মন দমিয়া যায়। এরূপ মানুষের দ্বারা সংসার, সমাজ, দেশের কোন কাজই হয় না, অপদার্থ জীবন ধারণ করিয়া পশুর ন্যায় দিন শেষ করে।

যে কোন স্থানেই যাই না কেন, সে যতই জনাকীর্ণ, দুর্গন্ধময় সহর হউক না কেন, আমরা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাই যে, সহরের যতটুকু উন্মুক্ত স্থান আছে, তাহা ইউরোপীয় ইংরাজ শিশু ও বালক বালিকায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পনের দিনের শিশু হইতে এক বৎসরের শিশুরা গাড়ীতে শুইয়া বায়ু সেবন করিতেছে। বয়স্ক বালক বালিকাগণ ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, কিংবা কোনও ব্যায়াম করিতেছে। এইরূপ ব্যায়ামের ফলে তাহাদের কি সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্যের জ্যোতি সম্পন্ন দেহ! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। কলিকাতায় ইডেন উদ্যানে

সন্ধ্যাকালে যখন বাজনা বাজিতে থাকে, তখন শত শত পাশ্চাত্য শিশু কেমন তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। তাহারা প্রত্যেকে যেন এক একটি গোলাপ ফুল। শত শত ফুলে বাগান যেন আলোকিত করিয়া রাখে। জন্ম গ্রহণের পর হইতেই পাশ্চাত্য পিতামাতা তাঁহাদের শিশু সন্তানের দৈহিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ মনোযোগী হন। তাঁহারা জানেন যে, সুস্থ দেহের মধ্যে সবল মন বাস করে। তাই ভবিষ্যতে এই শিশুগণই এ পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করে। আর আমরা ব্যায়ামের গুণ অবগত থাকিলেও তাহা কার্য্যে লাগাই না। সহরের দুর্গন্ধময় পল্লীতে অন্ধকার স্যাঁতসেতে গৃহে আমাদিগের অধিকাংশ লোকেরই বাস। শিশুদিগকেও আমরা তাহার মধ্যে দিবারাত্রি ভরিয়া রাখি। কখনো একটু উন্মুক্ত স্থানে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পাঠাই না। আমাদের শিশুদের শৈশবাবস্থা ত এইরূপে কাটিয়া যায়। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পড়ার চাপে তাহাদের অপুষ্ট দেহ শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ে, মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, চক্ষের জ্যোতিঃ কমিয়া আসে। মানসিক পরিশ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রম সমান ভাবে না করিলে এই অবস্থায় আসিয়া পড়িতে হয়। বর্ত্তমান সময়ের যুবকদের শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, বাঁকান পৃষ্ঠদেশ, পাণ্ডুর মুখ দেখিলে দেশের ভবিষ্যত ভাবিয়া শঙ্কিত হইতে হয়। যে দেশ চিরকালই শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, কি পরিতাপের বিষয়,—আজ সেই দেশের ভাবীবংশধরদিগের অবস্থা দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়। ৫০ বৎসরের পূর্ব্বেও এদেশে ব্যায়ামের চর্চ্চা প্রভূত পরিমাণে হইত। বাড়ীতে বাড়ীতে কুস্তির আড্ডা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, বাচখেলা লাঠি ও তরবারি খেলা, ধনুর্ব্বিদ্যা এবং অন্য নানারূপ ব্যায়াম চর্চ্চা হইত। ধনীরা বাড়ীর ছেলেদের ব্যায়াম শিখাইবার জন্য পালোয়ান দিগকে বাড়ীতে রাখিতেন।

বর্ত্তমান কালের যুবকদের শোচনীয় শারীরিক অবস্থার পরিণাম ভাবিয়া সকলেরই ব্যায়ামের প্রতি এক্ষণে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমাদের শৈশবে যতটা ব্যায়াম চর্চ্চা না হইতে দেখিয়াছি, এখন বালক ও যুবকদের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ব্যায়াম চর্চ্চা হইতে দেখিয়া এই আশার সঞ্চার হইতেছে যে, আবার দেশে দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ, বিশাল বক্ষ, দৃঢ় ভুজযুগল বিশিষ্ট বীরের আবির্ভাব হইবে।

বারবৎসর পর্য্যন্ত বালকবালিকা দিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উন্মুক্ত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু-সেবনের জন্য পাঠাইয়া দিবে। সেখানে তাহারা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিবে, দৌড়াইবে এবং বেড়াইবে। এই বয়সের বালক বালিকাদের পক্ষে Skipping একটি উত্তম ব্যায়াম। যাহারা হাঁটিতে পারে না—তাহাদিকে গাড়ী করিয়া কিংবা ভৃত্যের ক্রোড়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পাঠাইবে। শিশুকে যত কম কোলে রাখিবে ততই তাহার দেহ ভাল থাকিবে। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে তবে শিশুকে কোলে করিবে, নতুবা নহে। যে কোলে করে তাহার দেহের গরমে শিশু দুর্ব্বল হয়। ভৃত্যের সুবিধা না থাকিলে মাতা নিজে সংসারের অন্য সমস্ত কাজ ফেলিয়া শিশুকে লইয়া গৃহের ছাদের উপরে প্রাতে ও

সন্ধ্যায় বেড়াইবেন। শিশু হাঁটিতে পারিলে তাহাকে হাঁটাইবেন। প্রতি দিন অন্ততঃ তিন ঘণ্টা শিশুকে উন্মুক্ত স্থানে রাখিবেন। উন্মুক্ত স্থানে দূরে পাঠাইবার সুবিধা না হইলে বালক বালিকাদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ছাদে খেলা করিতে দিবে। বার বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগের পক্ষে খেলা, দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, ভ্রমণ, Skipping উত্তম ব্যায়াম। তাহার পর ডাম্বেল, ডন, বৈঠক, মুগুর ভাঁজা অল্প অল্প করিয়া বয়স অনুসারে করিলে বেশ উপকার হয়। কৈশোরও যৌবনে Sandow's Combined Developer দ্বারা তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে ব্যায়াম করিলে দেহের গঠন সুন্দর হয়, মাংস পেশী দৃঢ় হয়, বক্ষ প্রশস্ত হয়। বালকদিগের জন্য অন্য নানাপ্রকার ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে। Y. M. C. A. University Institute প্রভৃতি স্থানে যুবকদিগের নানাপ্রকার ব্যায়ামের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

বার বৎসর পর্য্যন্ত বালক ও বালিকাদিগের ব্যায়াম একই প্রকারের হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর বালিকাদিগের ব্যায়ামের প্রণালী অন্যরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু Sandow's Developer বয়স্কা বালিকাদিগের পক্ষেও অত্যন্ত উপযোগী ও উপকারী। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বালিকাদিগের জন্য কোন ব্যায়াম প্রণালী নির্দ্দিষ্ট নাই। গৃহ কর্ম্মে রত থাকিলে বালিকাদিগের পক্ষে সুন্দর ব্যায়াম হয়। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা, মসলা বাটাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুন্দর ব্যায়াম হয়। ঝাঁট দিবার অভ্যাস করিলে হাতের গঠন সুন্দর হয়। অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী পরমা সুন্দরী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ এক কলসী জল মাথায় লইয়া প্রাসাদের ছাদে বেড়াইতেন। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার দেহের গঠন সুন্দর হইয়াছিল। নিয়মিত ভ্রমণও বালিকা দিগের উত্তম ব্যায়াম। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নারীগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বলিয়া একদল নারী-হিতৈষী নারী উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া থাকেন। কাহারো কাহারো স্বাস্থ্য যদি ভাঙ্গিয়া গিয়াই থাকে, তবে তাহা উচ্চ শিক্ষার অপরাধ নহে, তাহা তাঁহাদের গৃহ শিক্ষার অপরাধ, পিতামাতার ত্রুটি। পিতামাতা যদি তাঁহাদের কন্যাদের মানসিক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা করিতেন তবে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদিগকে বলিবার এ ফাঁকটুকু রাখিবার অবসর দিতেন না। কন্যাদিগকে যেমন মানসিক শ্রম করিতে দিবেন ঠিক তেমনি শারীরিক শ্রমেও রত রাখিবেন, এবং তদুপযোগী পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করিবেন। তাহা হইলে উচ্চশিক্ষাও নারীদিগের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে সক্ষম হইবে না। বালিকাগণ যেমন লেখা পড়া করিতে থাকিবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহ কর্ম্মে রত থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। যাঁহাদের গৃহকর্ম্ম নিয়মিত ভাবে করিবার তেমন আবশ্যক হয় না তাঁহাদের ভ্রমণ, ছাদের সিঁড়িতে উঠা নামা, স্যাণ্ডোর developer কিংবা ½ অথবা ১ সের ওজনের ডাম্বেল লইয়া ব্যায়াম করা অত্যাবশ্যক। মোট কথা এই যে, মানসিক শক্তির পরিচালনার সহিত যাহাতে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্য-

ঙ্গের মাংস পেশীরও পরিচালনা হয়, প্রত্যহ এরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা সুস্থ জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অবশ্য ইহার সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে দেহের ও মস্তিষ্কের ক্ষয় নিবারণের উপযোগী পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে; নতুবা অকালে মৃত্যু হওয়া অথবা রুগ্ন হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী। আমরা এমন অনেক উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাকে জানি যাঁহাদের স্বাস্থ্য অটুট আছে, চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস হয় নাই। তাঁহাদের পিতামাতা তাঁহাদের পাঠ্যাবস্থায় মানসিক শ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের স্বাস্থ্যও সুন্দর আছে।

পল্লীগ্রামে পালিত ও বর্দ্ধিত শিশুগণ সাধারণতঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। তাহারা দিবারাত্রি উন্মুক্ত স্থানে বাস করে বলিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার সুবিধা পায় এবং পল্লীগ্রামের খাঁটি দুগ্ধ, ঘি খাইয়া বেশ বলিষ্ঠ হয়। পল্লীগ্রামের বালক বালিকাগণ পথে প্রান্তরে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, পুষ্করিণীতে সাঁতার দেয়, আম পাড়িবার জন্য গাছে চড়ে। ইহাতে তাহাদের বেশ ব্যায়াম হয়, দেহ সুগঠিত হয়। উন্মুক্ত স্থানের রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে অহর্নিশি থাকিয়া তাহারা সুস্থ ও সবল হইয়া বাড়িয়া উঠে। দুর্ব্বল, রুগ্ন, এবং অকাল প্রসূত শিশুদিগকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সহর হইতে দূরে স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিলে বিশেষ উপকার দেখা যায়।

ব্যায়ামই জীবন। দেহ ও মনের সুস্থতা ব্যায়ামের উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে দেহের মাংসপেশী ও tendons দুর্ব্বল ও থল্‌থলে হইয়া পড়ে এবং সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া যে শত শত শিরা উপশিরা রহিয়াছে তাহারা Sluggish ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আমাদের দেহের প্রতি নিমেষে ক্ষয় হইতেছে। বাহির হইতে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিয়া এই ক্ষয় পূরণ করিতে হয়। কিন্তু ব্যায়াম না করিলে দৈহিক যন্ত্রাদির কার্য্যশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বলিয়া পুষ্টিকর খাদ্য যথোপযুক্ত রূপে assimilate করিবার শক্তি ভালরূপ থাকে না। সুতরাং আমাদের দেহের ক্ষয় যতটা হয় পূরণ ততটা হয় না, কাজেই দেহ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে। ব্যায়াম অভাবে আমাদের দেহ যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া আমাদের খাদ্যের অসার অংশ দেহ হইতে সবটা বাহির করিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং এই সকল অসার অংশ দেহের মধ্যে জন্মিয়া নানা রোগবীজাণুর আকর হইয়া দাঁড়ায়।

সকলেই জানেন যে যন্ত্রাদি ফেলিয়া রাখিলে মরিচা ধরিয়া শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কাজে লাগিলে অনবরত ক্ষয় হইলে ও তাহাপেক্ষা অধিক দিন টেঁকে। আমাদের দেহ যন্ত্র ও ঠিক এইরূপ। শারীরিক ও মানসিক শ্রমে আমাদের দেহের যত না ক্ষয় হয়, অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে মরিচা ধরিয়া তদপেক্ষা দেহের অধিক ক্ষয় হয়। কিন্তু ইহা ও মনে রাখা উচিত যে আমাদের শ্রম যেন অতিরিক্ত না হয়।

উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার, বিশুদ্ধ বাতাস, নিয়মিত ব্যায়াম, নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপাদান।

What a baby should do.

সুস্থ শিশু সাধারণতঃ দুইমাস বয়সে আলো এবং বিভিন্ন রঙের প্রতি মনোযোগ দিবে এবং হাসিতে চেষ্টা করিবে।

তিন মাস বয়সে তাহার ক্ষুদ্র দেহটি একটু একটু তুলিয়া ধরিতে আরম্ভ করিবে এবং যাহা তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা ধরিতে চেষ্টা করিবে।

ছয় মাসের সময় বালিসে ঠেস দিয়া বসিতে পারিবে।

আট মাসে যে শব্দ শুনিবে এবং যে গতি দেখিবে তাহার অনুকরণ করিবে।

দশ মাসে বিনা সাহায্যেই বসিতে পারিবে এবং হামা গুড়ি দিতে চেষ্টা করিবে।

পনের মাসের সময় দৌড়াইতে এবং চেয়ার ঠেলিয়া দিতে পারিবে।

আঠার মাসে সিঁড়ি দিয়া উঠা নামা করিতে পারিবে।

দুই বৎসর বয়সে ছোট ছোট বাক্য sentence বলিতে পারিবে।

সুস্থ শিশুর পক্ষে সাধারণতঃ এই নিয়মই খাটে, কিন্তু অনেক স্থলে বহু শিশুর বিলম্বে সমস্ত কাজ হয়। তাহারা বিলম্বে বসিতে পারে, হাঁটে এবং কথা বলে। এইরূপ শিশুদের জোর করিয়া কিছু করাইবেনা। তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। তাহাদের উপযুক্ত সময় আসিলে তাহারা নিজেরাই সব করিবে। বিধাতা সময় মত তাহাদের কার্য্য তাহাদের দ্বারাই করাইবেন। তবে দুর্ব্বলতা ও অসুস্থতাবশতঃ এই বিলম্ব ঘটিলে তাহার প্রতিকার তখনি করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[রায় শ্রীচুনীলাল বসু আই, এস, ও এম, বি, এফ, সি, এস্ বাহাদুর]

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

—:*:—

আজ কাল এই রোগ পৃথিবীর নানা স্থানে মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের সর্ব্বত্রই এই রোগের প্রকোপে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এই রোগ ১৮৯০ সালে একবার দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সেবারে অনেক লোক রোগে আক্রান্ত হইলেও মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হয় নাই। এবারে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বঙ্গ ও বিহারের অনেকানেক স্থানে এই রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। কলিকাতায় এক সময়ে এই রোগে প্রতিদিন ৫০।৬০ জন মরিতেছিল; মফঃস্বলের অনেক স্থানের

মৃত্যুসংখ্যা কলিকাতা অপেক্ষা অনেক অধিক।

ইহা একটী সংক্রামক রোগ অর্থাৎ হাম, বসন্তের ন্যায় একজনের হইলে পাঁচজনের হইবার সম্ভাবনা। যাহাদের এই রোগ হইয়াছে, তাহাদের প্রশ্বাস, হাঁচি ও কফের সহিত এই রোগের বীজ দেহ হইতে বাহির হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং নিঃশ্বাসের সহিত উহা সুস্থ ব্যক্তির দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ রোগ উৎপাদন করে। নাক ও মুখের গহ্বরই রোগ-বীজের প্রবেশ পথ।

রোগের লক্ষণ কি কি, এই রোগ উপস্থিত হইলে কোন্ কোন বিষয়ে সাবধানতার আবশ্যক এবং যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোন স্থানে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিলে যদি কাহারো সর্দ্দি হয়, নাক দিয়া কাঁচা জল ঝরে বা খুব হাঁচি হয়, মাথা ধরে, গা গতরে বেদনা হয় এবং জ্বর ও কাশি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, খুব সম্ভব, তাহার ঐ রোগ হইয়াছে। অনেক সময়ে রোগ আর অধিক বাড়ে না, রোগী ৩।৪ দিন একই ভাবে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে।

রোগ বেশী হইলে জ্বর ও কাশি বাড়ে, শুক্‌নো কাশিতে রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায়, বুকে সর্দ্দি (Bronchitis) বসে, অনেক সময়ে নিউমোনিয়া (Pneumonia—ফুস-ফুসের প্রদাহ) দেখা দেয় এবং উহা হইতেই অনেক রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোন কোন রোগী শিরোবেদনায় অস্থির হয়, কেহ জ্বরের বৃদ্ধির সময় প্রলাপ বকিতে থাকে, সর্ব্বদা ঝাঁকিয়া উঠে এবং কাহাকেও চিনিতে পারে না। তখন তাহাকে ঔষধ ও পথ্য সেবন করান দুষ্কর হইয়া পড়ে। ক্রমে হৃৎপিণ্ড (Heart) অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, নাড়ী অতি দ্রুত চলিতে থাকে, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ে এবং অনেক সময়ে জ্বর কমিয়া গিয়া অত্যধিক ঘাম হয় এবং রোগী এইরূপ অবসন্ন অবস্থায় (Collapsed state) মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোন কোন রোগীর পেটের অসুখ হয়, কাহারো বা রক্ত বমি বা রক্ত দাস্ত হইতে দেখা যায়, কাহারো বা কাশির সহিত রক্ত উঠে অথবা নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

যাহাদিগের রোগ খুব কঠিন হয়, তাহারা প্রায় ৫ হইতে ১০ দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১। থিয়েটার, বায়োস্কোপ্ প্রভৃতি যে সকল স্থানে লোকের ভিড় হয়, তথায় গমন করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় জনতাপূর্ণ স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ এবং এইজন্য স্কুল কলেজ প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা উচিত।

২। কাহারো এই রোগ হইলে তাহাকে পাঁচজনের সহিত মেশামিশি করিতে দিবে না। রোগীকে পৃথক ঘরে রাখিবে এবং যাহারা তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাহারা ব্যতীত অপর কোন লোককে সে ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না।

৩। যতদিন রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ না করে, ততদিন তাহাকে শয্যা পরি-

ত্যাগ করিতে দিবে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই রোগে হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হঠাৎ উঠিতে যাইয়া অথবা চলাফেরা করিবার সময় রোগীকে মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে, এমন কি সময়ে সময়ে এই কারণে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও কিছু দিন তাহার চলাফেরা করা উচিত নহে।

৪। রোগ দেখা দিলেই ইউকালিপ্‌টস্ তেল (Oil Eucalyptus) তিন চারি ফোঁটা রুমালে ঢালিয়া রোগী উহা সর্ব্বদা শুঁকিতে থাকিবে। সুস্থ ব্যক্তিও (বিশেষতঃ যে বাটীতে রোগ দেখা গিয়াছে, তথাকার লোকেরা) রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় এই তৈল সর্ব্বদা শুঁকিলে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা।

৫। যাহাতে রোগীর গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাহার ঘরের দরজা জানালা সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। রোগীর দেহ সর্ব্বদা গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিবে; তাহার বুক পিট ফ্লানেল বা তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

৬। রোগী যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। দুগ্ধই এই রোগের উৎকৃষ্ট পথ্য—পেটের অসুখ না থাকিলে রোগীকে যথোচিত পরিমাণে দুগ্ধ, বার্লি বা সাগুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিতে দিবে এবং গরম জল বা সোডাওয়াটার্ রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দিবে।

৭। রোগের বৃদ্ধি হইতেছে বুঝিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিয়া রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বিনামূল্যে চিকিৎসক ও ঔষধ পাইবার এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, রোগের সূত্রপাত মাত্রেই চিকিৎসককে সংবাদ দিলে রোগীর চিকিৎসার তৎক্ষণাৎ সুবন্দোবস্ত করা হয়। বিলম্ব করিলে বিশেষ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

৮। রোগ সামান্য হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিয়া উপকার পাইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী এইরূপ ঔষধ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। এই ঔষধ বড়ি বা চাক্তির আকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে কোন ভাল ডাক্তারখানায় এই ঔষধ তৈয়ারি করাইয়া লওয়া যাইতে পারে :—

এমোনিয়া কার্ব্বনেট্—২ গ্রেণ।
সোডি বেঞ্জোয়েট্—২½ গ্রেণ।
কুইনিন্ সল্‌ফেট্—১½ গ্রেণ।
থাইমল্——½ গ্রেণ।

অল্প পরিমাণ গঁদের সহিত মিশাইয়া একটি বড়ি বা চাক্তি প্রস্তুত করা হয়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি একখানি চাক্তি দিবসে তিনবার সেবন করিলে উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বালকদিগের পক্ষে আধখানি এবং শিশুদিগের পক্ষে সিকি চাক্তি একমাত্রা ঔষধ।

৯। রোগীর বিছানা ও বস্ত্রাদি প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টার জন্য রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। সুস্থ ব্যক্তিকে রোগীর বিছানা বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে দিবে না। রোগ আরোগ্য হইলে বস্ত্র ও শয্যাদি জলে ফুটাইয়া সাবান দিয়া

পরিষ্কার করিয়া লইলে উহা পুনর্ব্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে।

১০। থাইমল (Thymol) বা পার্মঙ্গোনেট্ অব্ পটাস্ (Permanganate of Potash) নামক ঔষধ জলে অল্প পরিমাণে (½ গ্রেণ ঔষধ আধ সের গরম জলে) দ্রব করিয়া উহা দ্বারা দুইবেলা কুল্‌কুচা করিয়া মুখ ও গলার ভিতর ধুইয়া ফেলিবে এবং উহা হাতে লইয়া উহার "নাস" লইবে। নাকের ও মুখের মধ্যে এই রোগের বীজ প্রবেশ করিয়া তথায় লাগিয়া থাকে; উপরোক্ত ঔষধের সাহায্যে নাক মুখ ও গলা ধৌত করিলে রোগের বীজ নষ্ট হইয়া যায়। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী থাইমলের দ্রাবণ এইরূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১১। দুইফোঁটা ইউকালিপ্‌টস্ তেল বা ডালচিনির তেল (Oil of Cinnamon) অল্প চিনির সহিত মিশাইয়া দিবে দুই বার সেবন করিলে এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা।

বাটীতে সংক্রামক রোগ হইলে উহা নির্দ্দোষ করিবার ব্যবস্থা।

বাটীতে একজনের কোন সংক্রামক রোগ হইলে অপর পাঁচজনেরও ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং রোগীর আরোগ্যলাভ বা মৃত্যুর পর বাটীর ঘর দুয়ার এরূপ ভাবে পরিষ্কার করা উচিত, যাহাতে অপর কেহ ঐ রোগে আক্রান্ত না হয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে বাসগৃহ সহজে নির্দ্দোষ করিতে পারা যায়:—

১। এক পোয়া ফিনাইল্ (Phenyle) পাঁচসের জলের সহিত মিশাইয়া ঐ জলে "ন্যাতা" ডুবাইয়া বাটীর সমস্ত ঘরের মেঝে, দেয়াল, দরজা, জানালা প্রভৃতি এবং তক্তাপোশ, সিন্দুক, বাক্স, আলনা প্রভৃতি কাঠের আসবাব্ দুই দিন উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিবে।

২। বাটীর উঠান, নর্দ্দামা, পাইখানা, আঁস্তাকুড় প্রভৃতি স্থানে উপরোক্ত ফিনাইলের দ্রাবণ ঢালিয়া দিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

৩। রোগীর দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া তাহার ভিতর অন্ততঃ ২ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া গন্ধক জ্বালাইয়া রাখিবে।

৪। বাটীর সমস্ত অংশ (অন্ততঃ রোগীর গৃহ) ভাল করিয়া "চুণকাম" করিয়া দিবে।

৫। রোগীর গৃহের দরজা জানালা ৩।৪ দিবস সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিবে।

উপরোক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত হইবার পর ঐ গৃহে অন্য লোক বাস করিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।

উপসংহার।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পল্লীবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন, তাঁহারা দয়া করিয়া নিজ নিজ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিবেন না। তাঁহারা গ্রামে না থাকিলে গ্রামের কোনরূপ উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যাহাতে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, গ্রামের মধ্যে যাহাতে সুশিক্ষা বিস্তার লাভ করে, অজ্ঞানতামূলক সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইয়া, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যবন্ধন যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, কো-অপারেটিভ্ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া যাহাতে গ্রামবাসী কৃষক

ও শ্রমজীবিদিগের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়, আপাততঃ অসুবিধা ভোগ করিয়াও তাঁহারা গ্রামে থাকিয়া সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা, প্রয়োজনমত সরকার বাহাদুরের সাহায্য লইয়া, তৎসম্পাদনে বদ্ধ-পরিকর হউন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও কৃপায় তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টা শীঘ্রই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে।

শিশুমঙ্গল।

—:*:—

বাঙ্গালা দেশে যত শিশু মরে, এমন আর পৃথিবীর কোনো দেশে নহে। এই মৃত্যুর সংখ্যা সংপ্রতি এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, কর্ত্তৃপক্ষকেও তাহার জন্য চিন্তিত হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য কমিশনর ডাঃ বেণ্টলী এই জন্যই চৈত্র মাসের শেষে কলিকাতা সহরে স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া শিশুমৃত্যুর নিবারণ কল্পে নানারূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

কর্ত্তৃপক্ষের এবম্বিধ উদ্যোগ আয়োজন যে বিশেষ প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বেণ্টলী সাহেবের শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী বঙ্গবাসীর সকলের দেখিবার সুযোগ না হইলেও যে কয়জন কলিকাতাবাসী বা প্রবাসীর উহা দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জনকয়েকের নিকট হইতেও এ সম্বন্ধে সুফলের আশা করা না যায়। কারণ প্রদর্শনীয় প্রদর্শিত বিষয় গুলি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করার ফলে স্বভাবতঃই স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক তথ্য সহজেই অবগতি ঘটিবার কথা।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যে সকল উপায়ে শিশুমৃত্যু হ্রাস পাইয়াছে, আমাদের বাঙ্গালা দেশে শুধু তাহাই প্রচলিত করিলে সম্যক ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমাদের দেশের মহিলাগণ অশিক্ষিতা, সুতরাং পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে তাঁহাদিগকে শিক্ষিতা না করিলে যে বাঙ্গালাদেশে শিশু রক্ষার আদৌ সম্ভাবনা নাই এই যুক্তিতে আমাদের সম্পূর্ণ মতভেদ আছে। বাঙ্গালী মহিলাগণের অনেকে এখন যেরূপ স্কুলে পড়িয়া কলেজে পড়িয়া বিদুষী হইতেছেন, আগে সেরূপ ছিলনা। সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ, সমগ্র ভারতবর্ষে গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বীকার করি, ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার পরিমাণ পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় যৎসামান্য মাত্র, কিন্তু এমন দিনও যখন ভারতের ঘটিয়া ছিল যে খনা। লীলাবতীর যুগ পরিবর্ত্তনের পর ভারতীয় মহিলার দশ হাজারের মধ্যে এক জন মাত্রও বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন কি না সন্দেহ, অথচ তখন আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর কথা সামান্যই শুনা যাইত। এই জন্য আমরা বলিতে বাধ্য—বাঙ্গালা দেশের শিশু দিগকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে দেশে শুধু স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত করিলেই চলিবেনা, তাহা ভিন্ন করিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে।

সেকালের মহিলারা স্কুল কলেজের লেখা

পড়ার ধার কমই ধারিতেন বটে কিন্তু গৃহস্থালীর সকল কর্ম্মে তাঁহারা যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, সেকালে শিশুমৃত্যু কম হইত তাহারই ফলে।

সে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাদিগকে স্কুল কলেজে পড়িবার আবশ্যক হইত না, বাল্যে মাতার নিকট, কৈশোরে শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর নিকট গৃহস্থালীর কর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল শিক্ষা আপনা হইতেই অর্জ্জনের সুবিধা হইত।

ইহার ফলে সেকালে যে এখনকার তুলনায় দেশে শিশুমৃত্যু কম হইত তাহা নহে, সেকালের শিশুগণ দৃঢ়, সবল ও বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হইত, সেকালের লোকের দীর্ঘায়ু লাভ তাহারই ফল সম্ভূত।

আঁতুর ঘরের কদর্য্য ব্যবস্থা সেকালে যে ছিলনা তাহাও নহে কিন্তু সেকালের আঁতুর ঘরে শিশু ও প্রসূতিকে 'সেক তাপ দেওয়া', 'ঝাল মসলা' খাওয়ান প্রভৃতির যে পদ্ধতি ছিল, একালে তাহা অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। বেণ্টলী সাহেবের প্রদর্শিত সূতিকা গৃহের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের সমর্থন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে করিতেছি, কিন্তু শুধু তাহা করিলেই চলিবেনা, সেকালের মত আবার সেঁক তাপের ব্যবস্থা এবং প্রসূতিকে ঝালমসলা খাওয়ানরও বন্দোবস্ত ও করিতে হইবে।

অন্যান্য সকলে যাহাই বলুন আমরা শিশুমৃত্যুর আধিক্যের কারণ নির্দ্দেশে মুক্তকণ্ঠে বলিব, বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবই বাঙ্গালী শিশুর মৃত্যু বাহুল্যের সর্ব্বপ্রধান কারণ। বাঙ্গালী যে পরিমাণ পরিশ্রম করে, সে পরিমাণ খাইতে পায় না। দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার্য্য লাভ এখনকার দিনে অতি অল্প বাঙ্গালীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাবে বাঙ্গালী জাতির জীবনী শক্তি কমিয়া আসিয়াছে। কাজেই সেই ক্ষীয়মান-জীবনী বাঙ্গালী জাতির যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মিবে, তাহারা যে স্বল্পায়ু হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? প্রকৃত কথা, বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবই বাঙ্গালী জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে। সেই দুর্ব্বল পিতামাতার শুক্র-শোণিতের মিলনে সবল, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভের আশা আদৌ করা যায় না। এজন্য যদি বাঙ্গালা দেশ হইতে শিশুমৃত্যু নিবারণের চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির জন্য আগে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাঙ্গালীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর মাত্রা কমাইতে হইবে, বাঙ্গালীর দুশ্চিন্তার প্রতীকারে সচেষ্ট হইতে হইবে, মূল ধরিয়া চিকিৎসা করিলে তবে রোগের প্রতীকার হইবে, নতুবা এরূপ সংক্রামক রোগে শুধু মামুলী—বাঁধা ঔষধের ব্যবস্থা করিলে কোনও ফল হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

বেণ্টলী সাহেবের প্রদর্শনীর বক্তৃতা প্রসঙ্গে আর একটি কথা উঠিয়াছিল যে, Early marrage বাঙ্গালী জাতীর মধ্যে শিশুমৃত্যুর আর একটি কারণ। আমরা এ কথারও সমর্থন করিনা। কারণ Early marrage বহুকাল হইতে বাঙ্গালী জাতীর মধ্যে প্রচলিত। তাহার ফল পূর্ব্বে তো অশুভ শুনা যায় নাই। আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে

অনেকেই অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের ব্যবস্থা করিতেন। সে গৌরীদানের ফলে কার্ত্তিকের মত কান্তিমান ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভই ঘটিত। Early marrage বরং এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখন পণ-পীড়নে সেই মনুযুগের ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা না হইলে আর অনেকের পক্ষেই বিবাহ দেওয়া ঘটিয়া উঠে না। ফলে কন্যা পক্ষে Early marrage এখনকার দিনে আর বড় একটা ঘটিয়া উঠে না, তবে পাস করা পুত্রের বিবাহে অনেকেই অর্থের প্রলোভন ছাড়িতে না পারিয়া পাত্র পাত্রীর বয়সের পার্থক্য বজায় রাখিতে পারেন না। ইহাতে অনেক সময় কুফল ফলিতেছে, ইহা সত্য। পূর্ব্বে হিন্দু জাতীর মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও তখন যে এখনকারমত যখন তখন স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা ছিল না এ কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। তিথি নক্ষত্র দেখিয়া, পর্ব্ব দিন বাছিয়া, ঋতুকাল বিচার করিয়া তবে সেকালে স্ত্রীপুরুষের মিলন কাল নির্দ্দিষ্ট হইত। এখন যে এ সকল ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর শিশুমৃত্যু বাহুল্যের ইহাও একটি কারণ।

পল্লী-প্রসঙ্গ।

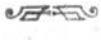

বসন্তের প্রকোপ এখনও বাঙ্গালার অনেক স্থলে পূর্ণভাবে বিরাজিত। তাহার উপর জ্বরের জ্বালা বাঙ্গালার অনেক পল্লীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। গত মাসে মেদিনীপুরের "নীহার" আমাদিগকে এ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলাম। ঐ "নীহার" পুনরায় আমাদিগকে সংবাদ দিতেছেন,—

জ্বরের প্রকোপ সর্ব্বত্র আবার বাড়িতেছে। প্রায় ঘরে ঘরেই লোক জ্বরে শয্যাগত। বসন্তের প্রাদুর্ভাবও সম্পূর্ণ কমে নাই।

শুধু মেদিনীপুর নহে, ২৪ পরগণা হইতেও আমরা জ্বরের সংবাদ পাইতেছি। "ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষীতে" প্রকাশ,—

স্থানীয় জলবায়ু ও স্বাস্থ্য।—এ সপ্তাহের মধ্যে দুই এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে। জ্বর-জ্বালার খুব প্রকোপ দেখা যাইতেছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জাও কোনো কোনো স্থলে ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। অনেক দুঃস্থ পরিবার ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত ঔষধাদির অভাবেও যারপর নাই কষ্ট পাইতেছে। শিলচরের "সুরমা" জানাইতেছেন,—

মৌলবীবাজার সবডিভিসনের অন্তর্গত কমলগঞ্জ থানার এলাকাধীন মুন্সীবাজার ও তন্নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন অনেক পরিবার আছে যে সমস্ত পরিবারে সকলেই পীড়িত, যত্ন শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই। আবশ্যক খাদ্য ও বস্ত্রাভাবে এই রোগ এমন প্রবল হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস অমূলক নহে। শ্রীহট্ট জেলার সুযোগ্য সিভিস সার্জ্জন সাহেব বাহাদুরও মনে করেন, খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে এই রোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জানা যায়, রোগীর সংখ্যার তুলনায় মুন্সীবাজার ডিস্‌পেন্‌সারীতে ঔষধের পরিমাণ অপ্রচুর। অবস্থা বিবেচনায় শীঘ্র উপযুক্ত ঔষধের সংস্থান করা

একান্ত প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে রোগীরা দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ পাইতেছে ও পাইবে, কিন্তু অনেক রোগীই পথ্যের জন্য সাগু, মিশ্রী ও বার্লি ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ বলিয়া পথ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে। ৶০—।৵০ আনা দরের মিশ্রীর সের ৸৵০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অনেকেই জ্বরের সময় গায়ে কাপড় দিতে পারিতেছে না।

বাঙ্গালার পল্লীগুলি তো ম্যালেরিয়ার পীড়নে ধ্বংসোন্মুখ। তাহার উপর অনেক স্থলেই সুচিকিৎসকের অভাব। ইহার কারণ বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণ রোগ বাহুল্য, বাঙ্গালা দেশে সে পরিমাণ চিকিৎসক নাই। মেদিনীপুরের "হিতৈষী" এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র ম্যালেরিয়া বিষে মেদিনীপুরের পল্লীগ্রাম সমূহ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ পল্লীগ্রামে চিকিৎসার অভাবে বিনা চিকিৎসায় কত লোকের যে জীবননাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বাঙ্গালার বীরভূম জেলা রোগ-পীড়নে কিরূপ বিপর্য্যস্ত তাহা "বীরভূমবাসীর" নিম্ন লিখিত সংবাদে অবগত হওয়া যায়।

বীরভূমে রোগ।—হরেক রকম রোগ বীরভূমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিউড়ীতে বহুলোক নিউমোনিয়ায় মরিল। রামপুরহাটে সদরে ও মফঃস্বলে ঐ রোগে মরিতেছে। বসন্তও এখানে ওখানে আছে। আবার নান্নুর থানার কোথাও কোথাও কলেরা দেখা দিয়াছে। সাঁইথিয়াতে একচোট বেরিবেরি হইয়া গেল। ভগবানের মতলবটা ভাল বলিয়া বোধ না।

মকরধ্বজের ব্যবহার প্রণালী।

[কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ভিষগাচার্য্য।]

—:•:—

নবজ্বরে—আদাররস ও মধুসহ, পানের রস ও মধুসহ অথবা তুলসীপাতার রস ও মধুসহ।

সান্নিপাতিক ঘোর বিকার অবস্থায়—মৃগনাভি ১ রতি, কর্পূর ½ রতি, আদার রস ১ তোলা ও মধুসহ।

হামজ্বরে—উচ্ছে পাতার রস ২ তোলা, হরিদ্রা চূর্ণ ২ রতি ও মধুসহ।

বসন্তরোগে—রুদ্রাক্ষ বসা ½ তোলা ও মধুসহ অথবা নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া আকনাদির মূল, পলতা, কট্‌কী, বাসকছাল, ত্বরালভা, আমলকী, বেণারমূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন। প্রতি দ্রব্য ১৫ রতি ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

পুরাতন জ্বরে—আদার রস, শিউলী পাতার রস ও মধুসহ। মুলতানি হিং ২ রতি, পিঁপুল চূর্ণ ২ রতি, সৈন্ধব লবণ ২ রতি ও পানের রস ২ তোলা সহ অথবা আদা গুলঞ্চ কুলেখাড়া ও নাটার কুঁড়ি, প্রতি দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া একত্র ছেঁচিয়া কলার পাতায় বাঁধিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

প্লীহায়—তালজটা ভস্ম ৩ রতি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় ½ তোলা সহ, মনসাপাতা সেঁকিয়া তাহার রস ½ তোলা ও মধুসহ, অথবা পিঁপুল চূর্ণ ৩ রতি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় ½ তোলাসহ।

যকৃৎরোগে—দারুহরিদ্রা নামক কাষ্ঠ জলের সঙ্গে শিলায় ঘসিয়া সেই ঘসা ২ তোলা ও মধু ½ তোলা সহ।

অরাতিদারে—মুথার রস ও মধুসহ বা বেলশুঁঠ চূর্ণ ২ রতি, জীরা চূর্ণ ২ রতি, চাউল ধোয়া জলে ও মধুসহ।

অতিসারে—বাবলাপাতার রস ও মধুসহ অথবা সোনাছাল বা কুড়চিছাল ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

আমাশয়ে—মরিচ চূর্ণ ৩ রতি ও কাঁটানটেরমূলের রস ২ তোলা সহ অথবা তেঁতুল পাতা বুড়ীপানের পাতা, থুলকুড়ির পাতা ও কয়েদবেলের পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

রক্ত আমাশয়ে—কুকসিমার রসও মধুসহ দাড়িম পাতার রস ও মধুসহ, আয়াপানের পাতার রস ও মধুসহ অথবা জামছালের রস, ছাগদুগ্ধ ও মধুসহ।

অর্শে—নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ ৬ রতি, মিছরী আধতোলা ও মাখন ২ তোলা সহ, অথবা ওলকচু চূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ।

অগ্নিমান্দ্যে—জোয়ান চূর্ণ ৬ রতি, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি ও কাগজী লেবুর রস সহ অথবা আদার রস ও সৈন্ধবলবণ সহ।

ক্রিমিতে—কটুকী ।০ তোলা, দাড়িমমূলের ছাল ॥০ তোলা বিড়ঙ্গ ॥০ তোলা, আপাঙ্গের পাতা ॥০ তোলা ও দারুচিনি ।০ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধুসহ। পালিধামাদারের ছাল চুণের জলে ছেঁচিয়া তাহার রস ও মধুসহ অথবা পালিধামাদারের পাতার রস ও মধুসহ।

পাণ্ডু, কামলারোগে—হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গুলঞ্চ, বাসকছাল, কটুকী, চিরতা ও নিমছাল প্রতি দ্রব্য ২০ রতি, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধুসহ অথবা হরীতকী চূর্ণ ৵০ আনা, পুরাতন ইক্ষুগুড় ।০ আনা ও কুলেখাড়ার রস ২ তোলা সহ।

রক্তপিত্তে—আলতা ৪।৫ থানা, পাকা যজ্ঞডুমুর ৮টা ও ছাগদুগ্ধ আধপোয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধু। দুর্ব্বা ও যজ্ঞডুমুর একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ও মধু, আয়াপানের পাতার রস ও মধু, অথবা বাসকপাতার রস ও মধু।

যক্ষ্মাকাসে—আয়াপানের পাতা, পাকা যজ্ঞডুমুর, কণ্টকারী ও বাসকপাতা একত্র ছেঁচিয়া ও পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা, ৩ রতি বংশলোচন চূর্ণ ও মধুসহ অথবা বাসকছাল ১ তোলা, অনন্তমূল ।০ তোলা, তেজপাতা ।০ তোলা, যষ্টিমধু ।০ তোলা ও কিস্‌মিস্ ।০ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধুসহ।

কাসে—আদা, তুলসীপাতা ও ব্যাকুড়ের পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ, পিঁপুল চূর্ণ ২ রতি, পানের রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা বাসক পাতার রস ও মধুসহ।

শ্বাসে—বহেড়া বীজের শাঁস ৵০ আনা, পিঁপুলচূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ, বহেড়া চূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ, অথবা কণ্টকারীর রস ২ তোলা ও মধুসহ।

হিক্কায়—ময়ূরপুচ্ছ ৬ রতি, পিঁপুলচূর্ণ ৩

রতি ও মধুসহ, কদলী মূলের রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা কচি তালের জল মধুসহ।

স্বরভেদে—যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধুসহ, বচের চূর্ণ ও মধুসহ অথবা ব্রাহ্মী শাকের রস ও মধুসহ।

অরোচকে—আমলকীর রস ও মধুসহ ও বা কুলভিজান জল ও মধুসহ।

বমন রোগে—স্তন দুগ্ধ ৫।৬ তোলা লইয়া তাহাতে ২।৩ খানা আলতার পাতা দিয়া মর্দ্দন করিবে, আলতার রং গুলিয়া গেলে ছাঁকিয়া তাহার ৪ তোলা, কর্পূর ½ রতি, শসা বীজের শাঁস ১২ রতি ও মধুসহ বা শ্বেত চন্দন ঘসা ১ তোলা, আমলকীর রস ১ তোলা ও মধু সহ।

তৃষ্ণায়—ক্ষেতপাঁপড়ার রস ও মধুসহ, বেদানার রস ও মধু সহ, মৌরি ভিজান জল ও মিছরী চূর্ণ সহ অথবা পটোলের রস ও মধু সহ।

মূর্চ্ছায়—ত্রিফলার জল ও মধু সহ, বড় এলাচের দানা চূর্ণ ও মধু সহ অথবা বহেড়া বীজের শাঁস ও মধু সহ।

দাহ রোগে—পলতার রস ও মধু সহ, ধনে পলতার কাথ ও মধু সহ, ক্ষেতপাঁপড়া ও বালা পাতা একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধু সহ বা রক্তচন্দন ঘসা ২তোলা ও মধু সহ।

উন্মাদ রোগে—শতমূলীর রস ও মধু সহ, ত্রিফলার জল ও মধু সহ অথবা ঘৃতকুমারীর রস ও মধু সহ।

অপস্মার রোগে—বচের চূর্ণ ও মধু সহ, কুষ্মাণ্ড জল ও মধু সহ, ব্রাহ্মী শাকের রস ও মধু সহ অথবা তিল তৈল ১ তোলা ও রসুন আধ তোলা সহ।

বাত রোগে—নিসিন্দার পাতা, বেল পাতা, গাঁদালের পাতা ও আদা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি ও মধু সহ, আলকুশীর বীজ চূর্ণ ৬ রতি, পুরাতন ঘৃত ।০ আনা মধু ৵০ আনা ও রসুনের রস ১ তোলা সহ অথবা আদা ও এরণ্ডমূল ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধু সহ।

বাতরক্ত ও কুষ্ঠে—অনন্তমূলের ক্বাথ ও মধু সহ অথবা অনন্তমূল, বেতের মূল, ছাতিম ছাল, কটকী সোণামুখী, দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা ও তোপচিনি প্রত্যেক ।০ আনা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধু সহ।

শূল ও অম্লপিত্তে—ফট্‌কিরি চূর্ণ ৵০ আনা কুকসিমার রস ২ তোলা ও মধু সহ, শুঁঠ ৫৩ রতি, এরণ্ডমূল ৫৩ রতি ও যবের চাউল ৫৩ রতি আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধু সহ অথবা ধনে ॥০ তোলা, মৌরী ॥০ তোলা ও জাঙ্গী হরীতকী ১ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধু সহ।

গুল্মে—জোয়ান চূর্ণ ৵০ আনা, বিট লবণ ৵০ আনা ও পরিষ্কার বোল আধপোয়া সহ।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগে—বরুণ ছালের রস ও মধু সহ, পাথরকুচির পাতার রস ও মধু সহ অথবা গোক্ষুরবীজ চূর্ণ ৵০ আনা, চিনি ॥০ তোলা ও তেলাকুচার পাতার রস ২ তোলা সহ।

জ্বালাযুক্ত মেহে—কাবাবচিনি চূর্ণ ।০ আনা কর্পূর ½ রতি, শ্বেত চন্দন ঘসা ১ তোলা ও মসিনা ভিজান জল সহ অথবা কাঁচা হলুদের রস ১ তোলা, শ্বেতচন্দন ঘসা ১ তোলা ও বাবলার আটা চূর্ণ ৩ রতি সহ।

শুক্র মেহে—কাবাবচিনি চূর্ণ ।০ আনা, কর্পূর ½ রতি, গুলঞ্চের রস ২ তোলা ও মধু সহ।

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গে—শিমুল মূলের রস ২ তোলা, চিনি আধ তোলা ও বলকা দুধ ১ ছটাক সহ, আলকুশী বীজ চূর্ণ ৩ রতি তালমূলী চূর্ণ ৩ রতি, চিনি ॥০ তোলা ও মাখন ২ তোলা সহ অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ২ তোলা চিনি ॥০ তোলা ও বলকা দুধ ১ ছটাক সহ।

শোথ রোগে—শ্বেত পুনর্নবার রস ও মধু সহ, বেলপাতার রস ২ তোলা ও মরিচ চূর্ণ ৩ রতি সহ অথবা শুষ্ক মূলা ১ তোলা কাঁচা বেলপাতা ॥০ তোলা, শুঁঠ ।০ তোলা ও বাঁশের শিকড় ।০ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া একছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

বৃদ্ধি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ও শ্লীপদে—সজিনা মূলের রস ও মধুসহ, হরীতকী চূর্ণ ৬ রতি, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি, পিঁপুল চূর্ণ ৩ রতি ও গরম জল সহ অথবা বেলপাতা, আদা ও নিসিন্দার পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ২ রতি ও মধু সহ।

নেত্র রোগে—ত্রিফলার জল ও মধুসহ অথবা ভীমরাজের রস ও মধুসহ।

নাসা রোগে—দাড়িম ফুলের রস ও মধু সহ বা অনন্তমূলের কাথ ও মধুসহ।

শিরোরোগে—জটামাংসী ভিজান জল ও মধুসহ, ত্রিফলার জল ও মধুসহ বা এরণ্ড-মূলের রস ও মধুসহ।

রজঃকৃচ্ছ্রে—রেণুকা চূর্ণ ৩ রতি ও মধু সহ, তিলের কাথ ও মধুসহ অথবা এরণ্ডমূল, বেড়েলা মূল, রক্তকম্বলের মূল ও ওলটকম্বলের মূল প্রতি দ্রব্য ॥০তোলা—আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া একছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

শ্বেত প্রদরে—ঘৃত ॥০ তোলা, মধু ।০ তোলা, চিনি ॥০ তোলা ও লাল জবা ফুলের কুঁড়ি—চাউল ধোয়া জলে ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা সহ অথবা বাবলার পাতার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

রক্তপ্রদরে—দুর্ব্বা, যজ্ঞডুমুর ও কাঁটা-নটের মূল একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ, বাবলার পাতা ও রক্ত কম্বলের কন্দ একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা অশোক ছালের কাথ ও মধুসহ।

সুস্থাবস্থায়—বেদানার রস ও মধুসহ অথবা মাখন ২ তোলা ও মিছিরী চূর্ণ আধ-তোলা সহ।

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

—:০:—

শিরোঃ রোগে—একটী পাতিলেবু গোবরের (গোময়) ঠুলিতে পুরিয়া তাহা ঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। লেবুর উপরিস্থিত গোময় আবরণ পুড়িয়া গেলে লেবুটী এক রাত্রি শিশিরে রাখিতে হইবে, পরিশেষে এক তোলা সোরা ও অর্দ্ধতোলা গব্যঘৃত তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই ঔষধ মস্তকে ও কপালে প্রলেপ দিলে যে কোন প্রকার শিরোরোগ হউক না কেন আরোগ্য হইবে।

প্রস্রাব বন্ধে—কুমড়ার (জলকুমড়) বৃক্ষের ক্ষার ও সোরা সমভাগে মিশাইয়া ৵০ আনা অথবা ৶০ আনা পরিমাণে ঠাণ্ডা-জল সহ সেবন করিতে হইবে।

নালীক্ষতে—গন্ধভাদালীর পাতার রস ও তামাক পাতার রস একত্র মিশাইয়া কিছু তূলাতে লাগাইয়া নালীর ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। দিনে ৩।৪ বার প্রয়োজ্য।

আমাশয় জন্য উদরের বেদনায়—আমরুলের পাতার রস গরম মধুসহ খাইলে উপকার হয়।

বিবিধ ক্ষতে—শ্বেত কাঞ্চন ফুল—জল দ্বারা বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিতে হইবে।

রক্তমূত্রে—নিমছালের রস এবং আলতা ধোওয়া জল সমপরিমাণে খাইতে হইবে।

প্রস্রাব বন্ধে—পুঁই শাকের ডাঁটা, মেটে কলসের উপরের মাটী, তিলের খোসা, সোরা, 'কাঁচা' বাঁশের উপরের ছাল একত্র সমভাগে লইয়া উত্তম করিয়া বাটিয়া পরে জয়ন্তী পুষ্পের পাতা ২ তোলা বাটিয়া উক্ত ঔষধের সহিত মিশাইয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই উপকার হইবে।

কাণ পাকায়—মান মচুর কচি পাতার রস কর্ণে দিলে বেশ ফল হয়। রস প্রয়োগের পরে তুলা দ্বারা কাণটী কিছুক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

আধকপালে মাথার বেদনায়—উননের পোড়া মাটি এবং লঙ্কা সমভাগে চূর্ণ করতঃ নস্য গ্রহণ করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়।

উপদংশে—একটী লৌহ পাত্রে থুঁথু দিয়া একটী জাঙ্গী হরীতকী ঘষিতে হইবে। পরে কিছু খদির তাহাতে পুনরায় মিশাইতে হইবে। যখন ঔষধ বেশ ঘন হইবে তখন ৩টী কাঁটা ন'টের শিকড় ঘষিলে মলম হইবে, সেই মলম উপদংশ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে অল্প দিনেই ক্ষত নিশ্চয়ই শুষ্ক হইবে। ঔষধে যেন জল না লাগে।

পোড়া ঘায়ে—হরিদ্রা পাতা অথবা তুলসী পাতা বাটিয়া প্রয়োগ করিলে বেশ ফল হয়।

ছর্দ্দি রোগে—(১) বেলের বীজের শাঁস ২ রতি শ্বেত চন্দন ঘষা আধ আনা—একত্র সেবন করিতে হইবে।

বাধী বসান—কলিচুণ, চিংড়ীমাছ, শ্বেত-চিতা মূল সমপরিমাণে একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

প্লীহা রোগে—আমড়া পাতার রস দ্বারা আমড়া বাটিয়া প্লীহা স্থানে প্রলেপ দিতে হইবে।

একশিরা রোগে—তামাক পাতার উপরে শুঁঠের চূর্ণ কিছু ছড়াইয়া দিয়া এক শিরার উপর বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। বেশীক্ষণ রাখিলে বমি হইতে পারে।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী]

উদ্বেষ্টন।

যখন শরীরে রক্তের শুষ্কতা হইতে আরম্ভ হয় এবং মর্ম্মগ্রন্থি হইতে শ্লেষ্মরাশি ক্রমশঃ তরল হইয়া স্খলিত হইতে থাকে সেই সময় এক এক স্থানে এক এক বার ভঙ্গবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগীকে সাতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করে। দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় অতীব অধীর হইয়া রোগী সর্ব্বদাই আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। এইরূপ বেদনাকে উদ্বেষ্টন বলে। চলিত ভাষায় ইহাকে খালধরা বলা যায়। যে প্রকার বীজাণু দ্বারা শরীরস্থ রক্ত ও শ্লেষ্মা রূপান্তরিত হইয়া স্থানভ্রষ্ট হয়, কোন উপায়ে সেই বীষাণু বিনষ্ট হইলেই এই উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। পূর্ব্ব কথিত বিষর্পণ চূর্ণের স্বরূপ যে ধুস্তুর পুষ্পের কেশর ও গোলমরিচ সেবনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কোনোরূপে উদরে স্থিতিশীল হইলে ওলাউঠা রোগে কোন প্রকার উপদ্রবই হইতে পারে না। উদ্বেষ্টন প্রভৃতি কোনো কোনো উপদ্রব মৃদুভাবে আক্রমণ করিলেও তাহা দূর করিবার জন্য আর বিশেষ কোন রূপ চেষ্টা করিতে হয় না। আপনা হইতেই প্রশমিত হইয়া থাকে। কুড়, সৈন্ধব লবণ কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ অথবা যখন যে স্থানে খাল ধরিতে থাকে সেই স্থানে মর্দ্দন করিলে উহা দূরীকৃত হয়। গুড়ত্বক, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও গুল্‌ফা—এই সমুদয় সমভাবে লইয়া কাঁজির সহিত বাঁটিয়া খল্লীস্থলে (খাল) মর্দ্দন করিলে সুমহান উপকার হইয়া থাকে। আদা এক ভাগ, সোরা এক ভাগ, তিষি দুইভাগ, মাষ-কলাই চার ভাগ—একত্র জলে বাটিয়া কাপড়ের পুঁটলিতে অল্প অল্প গরম করিয়া হাতে পায়ে স্বেদ দিলে খাল ধরা আরাম হয়। ভ্যারেণ্ডার বীজ, ভ্যারেণ্ডার মূল, ভ্যারেণ্ডার পাতা ও হিং প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া সকলের তুল্য পরিমাণ চিনির সহিত মিশাইয়া এক সঙ্গে বাটিয়া পূর্ব্ববৎ স্বেদ দিলে খালধরা ছাড়িয়া যায়। মহীলতা (কেঁচো) গোটাকতক